শুকতারা

চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ
দশম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৯৮

ভেলকির খেলা

ময়ূখ চৌধুরী রচিত ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী

পরবর্তী অংশ ভিতরে…

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ডায়মন্ড কমিকস্ -এর নিবেদন

মূল্য ঃ 12.00

প্রতি মাসে ফ্যান্টমের নতুন নতুন কাহিনী ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার সংগে সংগে বাংলা ভাষাতেও প্রকাশিত হয়।

সারা বিশ্বে ১৫০ টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো-সবার পক্ষে সমান মনোরঞ্জনের পাত্র। এই শক্তিশালী এবং রহস্যময় পাত্রের সৃষ্টিকর্তা হলেন শ্রী লী ফক্, যিনি জনপ্রিয় ম্যানড্রেক-এরও সৃষ্টি করেছিলেন।

কার্টুনিস্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী একজন বুদ্ধিমান মানুষ, যার কাছে সব সমস্যার সমাধান মজুত থাকে। জুপিটার বাসী অসীম শক্তিমান সাবু চাচা চৌধুরীর সাহায্যকারী। শক্তি আর বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

চাচা চৌধুরী ও সাবুর দুটো পোস্টার ফ্রী

আগামী দুটি বাম্পার ডাইজেস্ট

চঞ্চল, দুষ্ট পিঙ্কী কার্টুনিস্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি। পিঙ্কী, ওর দাদু আর প্রতিবেশী ঝপটজীর অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড-কারখানা দেখে হাসতে হাসতে তোমাদের পেটে খিল ধরে যাবে।

চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট viii, (পৃষ্ঠা-160) মূল্য ঃ 20/- এবং পিঙ্কী ডাইজেস্ট iv, মূল্য ঃ 15/-

এ পর্যন্ত্য প্রকাশিত বাংলা ডায়মন্ড কমিকস

চাচা চৌধুরী ও রাকা
চাচা চৌধুরীর দুঃসাহস
চাচা চৌধুরী অন্তরীক্ষে
চাচা চৌধুরী ও নরখাদক
চাচা চৌধুরী ও [illegible]
চাচা চৌধুরী ও সাবুর অপহরণ
চাচা চৌধুরী ও [illegible]
চাচা চৌধুরী ও গোলামের বিক্রি
চাচা চৌধুরী ও রাকার সঙ্গে সংঘর্ষ
চাচা চৌধুরী আর কারুবেকের সোনা
চাচা চৌধুরী আর হাইওয়ের ডাকাত
চাচা চৌধুরী আর ইঞ্জিন রহস্য
চাচা চৌধুরী আর বিদেশী গাড়ী
চাচা চৌধুরী আর আরমান আলী ফারমান আলী
চাচা চৌধুরী আর একফোঁটার তীরে

চাচা চৌধুরী আর যুধিষ্ঠিরের মুকুট
চাচা চৌধুরীর সুবিচার
চাচা চৌধুরী ও গব্বর সিং-এর মোকাবিলা
চাচা চৌধুরী ও বোতলের দৈত্য
চাচা চৌধুরী ও শিকারী মকড়ধ্বজ সিং
চাচা চৌধুরী ও করাটে সম্রাট
চাচা চৌধুরী ও সাবু কালো শহীদ
চাচা চৌধুরী ও হাতীর ব্যবসা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর ওপর আক্রমণ
চাচা চৌধুরী ও দৌলত-সম্পত্ত
চাচা চৌধুরী ও সাবুর হাতুড়ী
চাচা চৌধুরী ও পটিপার কোমর
চাচা চৌধুরী ও গোপলিলাল
চাচা চৌধুরী ও হাকিম আমানদোহী

চাচা চৌধুরী ও রাকার পুনরাগমন
চাচা চৌধুরী ও রাকার প্রতিশোধ
চাচা চৌধুরী ও [illegible]
চাচা চৌধুরী ও উড়ন্ত কার
চাচা চৌধুরী ও রহস্যময় চোর
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বুট
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বিয়ে
চাচা চৌধুরী ও চাঁদের চাষ
চাচা চৌধুরী ও ক্রিকেট ম্যাচ
চাচা চৌধুরী ও [illegible]
চাচা চৌধুরী বিল্লু ও পিঙ্কী
চাচা চৌধুরী আমেরিকায়
চাচা চৌধুরী চোরের খোঁজে
চাচা চৌধুরী আর বেনারসী জোচ্চোর

চাচা চৌধুরী জুপিটারে
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট i
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট ii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট iii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট iv
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট v
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট vi
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট vii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট viii
পিঙ্কীর পুরী
পিঙ্কীর ক্যামেরা
পিঙ্কীর জন্মদিন
পিঙ্কীর কুকুরছানা
পিঙ্কীর মা ও বাবা

পিঙ্কী আর জোকার
পিঙ্কী আর হাতেমতাই
পিঙ্কী আর [illegible]
পিঙ্কী আর সাবানের বুদবুদ
পিঙ্কী আর চোর সুলেমানী
পিঙ্কী আর ঝপটজীর ঘুড়ি
পিঙ্কী আর লটারীর টিকিট
পিঙ্কী আর বিনা পয়সার কুল
পিঙ্কী আর [illegible]
পিঙ্কী আর রূপবতী
পিঙ্কীর জুতো
পিঙ্কী ডাইজেস্ট i
পিঙ্কী ডাইজেস্ট ii
পিঙ্কী ডাইজেস্ট iii
পিঙ্কী ডাইজেস্ট iv

চঞ্চল চরিত্র বিল্লু

কার্টুনিস্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু-র দুষ্টুমীভরা কাহিনী খুব শীঘ্রই বাংলা ভাষায় প্রকাশ পেতে চলেছে। কিশোর বিল্লুর সংগে ওর সংগীসাথী গাব্দু, জোজি ও বজরংগী পালোয়ানের হাসিঠাট্টা আর দুষ্টুমী যেমন একদিকে তোমাদের মজা দেবে, আবার হাসাতে হাসাতে পেটে খিলও ধরিয়ে দেবে। খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছের বুকস্টলে আসছে কার্টুনিস্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র বিল্লু-র কান্ডকারখানা।

ডায়মন্ড পকেট বুকস-এর নিবেদন

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর সগর্ব নিবেদন 'ডায়মন্ড ইংলিশ স্পিকিং কোর্স'-যা আপনাকে ইংরাজী ঠিকমত বলতে না পারার হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। নিজের কাজ, ব্যবসায় ও বন্ধুদের সংগে শুদ্ধভাবে ইংরাজীতে কথা বলে নিজের মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়ান।

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর আরেকটি সগর্ব প্রকাশন-'ডায়মন্ড বেঙ্গলী লারনিং এ্যান্ড স্পিকিং কোর্স থ্রু ইংলিশ"-এই বইটি আপনাকে ভারতের পনেরোটি রাষ্ট্রীয় ভাষার মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা 'বাংলা ভাষা' শেখাতে সাহায্য করবে।

DIAMOND COMICS PVT. LTD.

2715, DARYA GANJ, NEW DELHI-2.

DISTRIBUTORS : VISHAL BOOK CENTRE, 4, TOOTI LANE CALCUTTA-16.

বাঁটুল দি গ্রেট

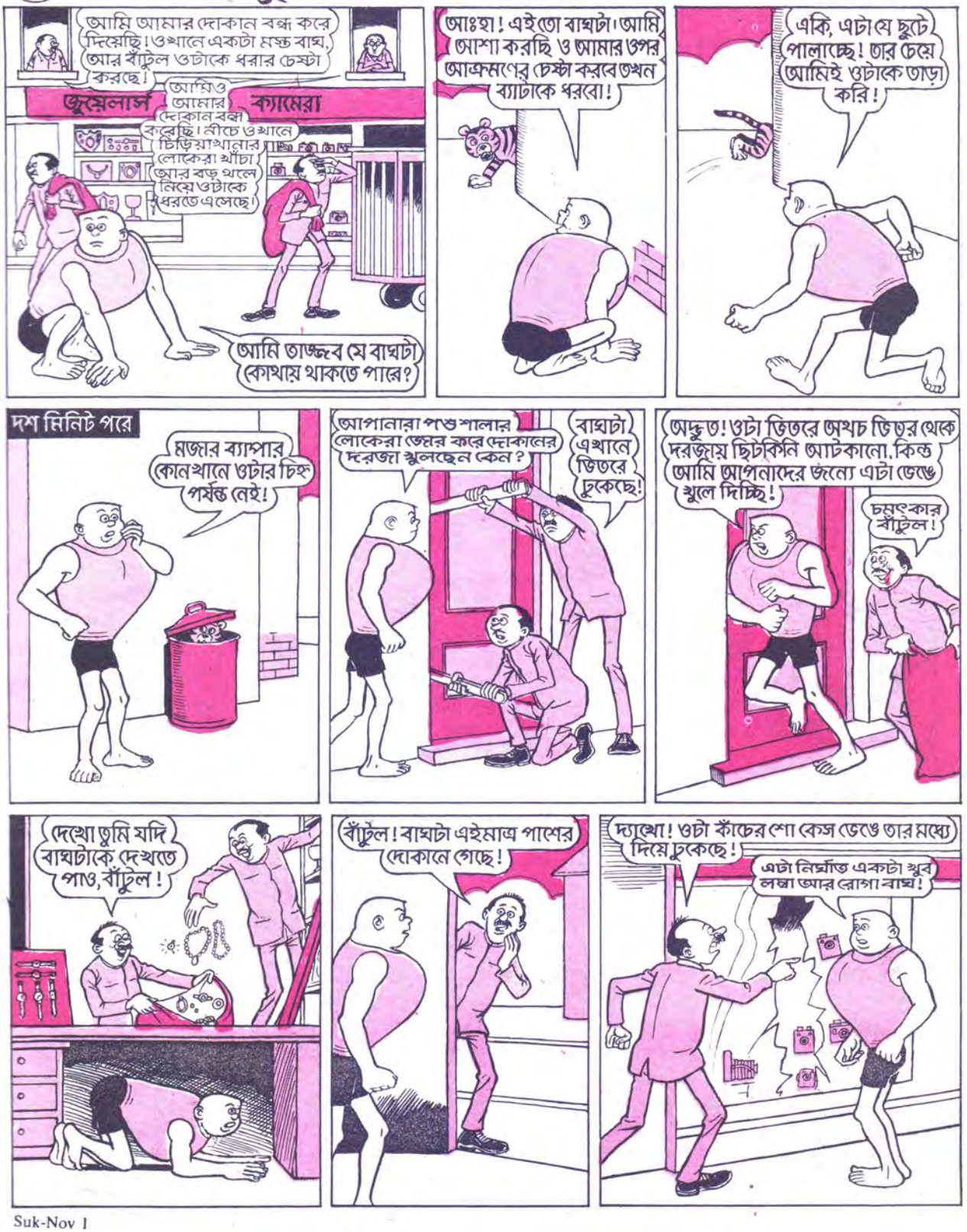
আমি আমার দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। ওখানে একটা মস্ত বাঘ, আর বাঁটুল ওটাকে ধরার চেষ্টা করছে!
জুয়েলার্স
ক্যামেরা
আমিও আমার দোকান বন্ধ করেছি। নীচে ও খানে চিড়িয়াখানার লোকেরা খাঁচা আর বড় থলে নিয়ে ওটাকে ধরতে এসেছে!
আমি তাজ্জব যে বাঘটা কোথায় থাকতে পারে?
আঃহা! এইতো বাঘটা। আমি আশা করছি, ও আমার ওপর আক্রমণের চেষ্টা করবে তখন ব্যাটাকে ধরবো!
একি, এটা যে ছুটে পালাচ্ছে! তার চেয়ে আমিই ওটাকে তাড়া করি!
দশ মিনিট পরে
মজার ব্যাপার কোনখানে ওটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই!
আপনারা পশু শালার লোকেরা জোর করে দোকানের দরজা খুলছেন কেন?
বাঘটা এখানে ভিতরে ঢুকেছে!
অদ্ভুত! ওটা ভিতরে অথচ ভিতর থেকে দরজায় ছিটকিনি আটকানো, কিন্তু আমি আপনাদের জন্যে এটা ভেঙে খুলে দিচ্ছি!
চমৎকার বাঁটুল!
দেখো তুমি যদি বাঘটাকে দেখতে পাও, বাঁটুল!
বাঁটুল! বাঘটা এইমাত্র পাশের দোকানে গেছে!
দ্যাখো! ওটা কাঁচের শো কেস ভেঙে তার মধ্যে দিয়ে ঢুকেছে!
এটা নির্ঘাত একটা খুব লম্বা আর রোগা বাঘ!

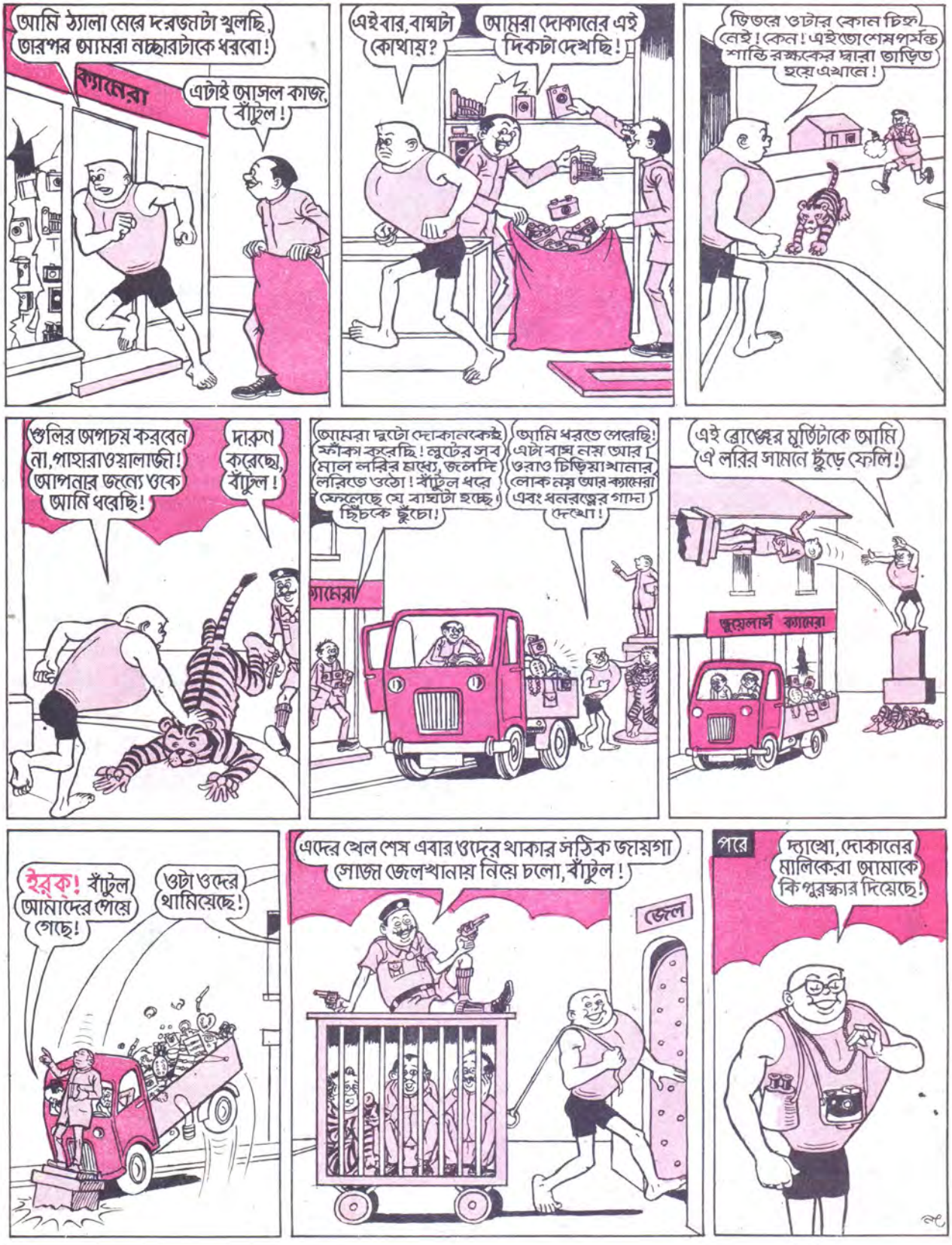
আমি ঠ্যালা মেরে দরজাটা খুলছি, তারপর আমরা নচ্ছারটাকে ধরবো!
ক্যামেরা
এটাই আসল কাজ, বাঁটুল!
এইবার, বাঘটা কোথায়?
আমরা দোকানের এই দিকটা দেখছি!
ভিতরে ওটার কোন চিহ্ন নেই! কেন! এইতো শেষপর্যন্ত শান্তিরক্ষকের দ্বারা তাড়িত হয়ে এখানে!
গুলির অপচয় করবেন না, পাহারাওয়ালাজী! আপনার জন্যে ওকে আমি ধরেছি!
দারুণ করেছো, বাঁটুল!
আমরা দুটো দোকানকেই ফাঁকা করেছি! লুটের সব মাল লরির মধ্যে, জলদি লরিতে ওঠো! বাঁটুল ধরে ফেলেছে যে বাঘটা হচ্ছে ছিঁচকে ছুঁচো!
আমি ধরতে পেরেছি! এটা বাঘ নয় আর ওরাও চিড়িয়াখানার লোক নয় আর ক্যামেরা এবং ধনরত্নের গাদা দেখো!
ক্যামেরা
এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটাকে আমি ঐ লরির সামনে ছুঁড়ে ফেলি!
জুয়েলার্স ক্যামেরা
ইরুক! বাঁটুল আমাদের পেয়ে গেছে!
ওটা ওদের থামিয়েছে!
এদের খেল শেষ এবার ওদের থাকার সঠিক জায়গা সোজা জেলখানায় নিয়ে চলো, বাঁটুল!
জেল
পরে
দ্যাখো, দোকানের মালিকেরা আমাকে কি পুরস্কার দিয়েছে!

শুকতারা

অগ্রহায়ণ ১৩৯৮
নভেম্বর ১৯৯১

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO No. 456(17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ৬৫ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে—৮৫ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪৫ টাকা।

R.N.I. Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ■
ভেলকির খেলা (রঙিন ছবিতে গল্প)
—ময়ূখ চৌধুরী

ধারাবাহিক ■
ডাক্তার নরুদার চ্যালেঞ্জ (কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস)
—অজেয় রায় ৮০
ত্রয়ীর অভিযান (একটি ঘরের রহস্য) —পরাশর রায় ১৩৮
টারজান মহীয়ান (অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী)—সব্যসাচী ১১৭

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনী ■
অর্কর গোয়েন্দাগিরি
—মঞ্জিল সেন ৯০

গল্প ■
জাহাঙ্গীরের ছুরি
—সঞ্জয়কুমার ভুঁইয়া ১৪২

হাসির গল্প ■
শকুন্তলার টিকি—দীপঙ্কর বিশ্বাস ৮৪

বিশ্বসাহিত্য ■
মারতিনের গল্প—গোরাচাঁদ পাল ৯৮

শিকারের গল্প ■
বাঘবন্দী—বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮

গল্প হলেও সত্যি ■
মাছটির নাম বহুরূপী
—শৈলেশ ভড় ৭৮

প্রতিযোগিতার গল্প ■
জীবনমরণ (প্রথম)
—নন্দিনী ঘোষ ১২৯
বিজয়ীর আনন্দ (দ্বিতীয়)
—স্বপনকুমার প্রামাণিক ১৩০

বীর বাঙালী ■
নির্বাসিত রাজকুমার বিজয় সিংহ
—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪

ফিচার ■
অমৃতকন্যা—নন্দলাল ভট্টাচার্য ১২২
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ১০৮
এই মাসে—সুবন্ধু শর্মা ১২৫

বিশ্ববিচিত্রা ■
জিজ্ঞাসা ১০১
সত্যি ! ১০৪

কবিতা ■
ভোজবাজি—সুবীর গুপ্ত ৭৭
স্বপ্নের ফিরিওলা
—অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ১০০

ম্যাজিক ■
পয়সার খেলা (রঙিন কমিকসে)
—যাদুকর পি·সি·সরকার (জুনিয়ার) ১০৬

ছবিতে গল্প ■
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ৭৩
বাহাদুর বেড়াল (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১০৫
হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ১৩২
বিলির বুট (রঙিন) ১০২
আলপসের তুষার রাজ্যে
ম্যাম'জেল এক্স ১২০

বিভাগীয় লেখা ■
খেলা
—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯
পড়ার সঙ্গে খেলা —বীরু বসু ১১৫
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ১১৬
দাদুমণির চিঠি ১২৬
তোমাদের পাতা ১২৭
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ১৩৬

ঘোষণা ■
অনিমেষচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ১৩১
জানো কী ১১৩

অনুবাদ সিরিজ

বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় দেব সাহিত্য কুটীরের নতুন সংযোজন

জ্যাক লন্ডন-এর
হোয়াইট ফ্যাং
কল অব দ্য ওয়াইল্ড

রিচার্ড হেনরি ডানা-র
ট্যু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট

হেনরি হল কেইন-এর
দ্য বন্ড ম্যান

জোয়ান রুডলফ ওয়াইজ-এর
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

চার্লস কিংসলি-র
হাইপেশিয়া

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্-এর
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্‌স্
ইনভিজিবল ম্যান
দ্য স্লীপার অ্যাওয়েক্‌স্

মার্ক টোয়েনের
অ্যাডভেঞ্চারস্ অব টম সইয়ার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন্
এ কনেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থাস কোর্ট
দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার
পাডনহেড উইলসন

ভিক্টর হ্যুগোর
লা মিজারেবল
টয়লার্স অব দ্য সী
হাঞ্চব্যাক অফ নংরদাম
দ্য ম্যান্ হু লাফ্‌স্

এরিক মারিয়া রেমার্ক
দি ব্ল্যাক অবলিস্ক
অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট

এডগার ওয়ালেসের
ট্রেইটরর্স গেট

র‍্যাফেল সাবাটিনির
অ্যাক্রস দ্য পিরেনিজ
দি লস্ট কিং

জুলে ভার্ণের
জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ
রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্রি ডেজ

চার্লস ডিকেন্সের
নিকোলাস নিকোলবি
এ টেল অব টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
ডেভিড কপারফিল্ড
অলিভার টুইস্ট

লাইটহাউস

হেনরি রাইডার হাপার্ড-এর
দি মুন অব ইজরায়েল
কিং সলোমন্‌স্ মাইন্‌স্

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
কিডন্যাপ্‌ড
ব্ল্যাক অ্যারো
ট্রেজার আইল্যান্ড
ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড
দ্য বটল ইম্প

ওয়াল্টার স্কট-এর
রব রয়
আইভ্যান হো
ট্যালিসম্যান
দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ

জেমস কুপারের
দ্য লাস্ট অব দি মহিক্যান্‌স্
দ্য পাথ ফাইন্ডার

জর্জ এলিয়টের
মিড্‌ল মার্চ
সাইলাস মার্নার

আলেকজান্ডার দুমার
থ্রি মাসকেটিয়ার্স
দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক
দি কন্সপিরেটর্স
কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো
ব্ল্যাক টিউলিপ
কাউন্টেস দ্য চার্নি

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শুকতারা

৪৪শ বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● অগ্রহায়ণ ১৩৯৮/নভেম্বর ১৯৯১

ভোজবাজি

সুবীর গুপ্ত

কলম নিলাম, কালি নিলাম
নিলাম তুলি হাতে
ভূতের ছবি আঁকবো বলে
গেলাম চলে ছাতে ॥

ন্যাড়া ছাতের কার্ণিশেতে
মামদো ভূতের নাতি
ব্যাজার মুখে বসেছিল
মাথায় কালো ছাতি ॥

বললে আমায়, এদিকে আয়
বড্ড সাহস তোর
যেমন খুশি মারব ঘুঁষি
দেখবি হাতের জোর ॥

ভূতের ছবি আঁকতে তোকে
কে বলেছে বল
ভাঙবো তোর দাঁতের গোড়া
আমায় নিয়ে চল ॥

ছবি আঁকা রইলো মাথায়
পিছলে পড়ি ছাতে
উল্টে গেল কালির দোয়াত
সাদা খাতার পাতে ॥

এটা কেমন ভোজবাজি
অবাক কান্ড একি
মামদো ভূতের প্রতিচ্ছবি
খাতার পাতায় দেখি ॥

ছবি : দিলীপ দাস

গল্প হলেও সত্যি

মাছটির নাম বহুরূপী

শৈলেশ ভড়

তোমরা নিশ্চয়ই জানো পশুপক্ষীকে ভালবাসলে তারাও আমাদের ভালবাসে। কিন্তু মাছ? তারাও কি ডাঙার প্রাণীদের মতো ভালবাসার কাঙাল? তাহলে একটা ঘটনার কথা বলি শোন।

চলচ্চিত্র পরিচালক ডুগান একবার স্থির করলেন সামুদ্রিক মাছেদের নিয়ে একটি ছবি করবেন। পরিকল্পনামতো আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। এই ছবি তোলার জন্য ডুগান বেছে নিয়েছিলেন ভারত মহাসাগরে বিষুবরেখার কাছাকাছি একটি স্থান। ডুগানের সঙ্গী হলেন মৎস্য-গবেষক মার্ডেন, মৎস্য-চিকিৎসক ডেনিস, ক্যামেরাম্যান ডেলমাস সহ আরও কয়েকজন।

লক্ষ্যস্থানের খুব কাছে একটি প্রবাল দ্বীপের কিনারে ডুগানদের জাহাজ নোঙর ফেললো। দ্বীপটি ভারি সুন্দর। দুশো ফিট অবধি এমন স্বচ্ছ জল আর কোথাও নেই। ছবি তোলার পক্ষে খুব সুবিধে।

ডেলমাস নেমে পড়লেন ডুবুরীর পোশাক পরে। তলায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। তারপর জাহাজে উঠে এসে বললেন, 'চমৎকার জায়গা। তলায় নানারকমের প্রচুর মাছ আছে। মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে, কিন্তু ছবি তোলা যাবে না।'

এ কথা শুনে মৎস্য-গবেষক মার্ডেন জলে নামলেন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে। তিনি ফিরে এসে বললেন, 'মাছেদের সঙ্গে কথা হলো। তারা বন্ধুত্ব করতে রাজী, কিন্তু ছবি তুলতে দেবে না বলে দিয়েছে।'

'কেন? কেন?' অবাক পরিচালক ডুগান বললেন, 'তারা কি আমাদের ছবিটা বানাতে দিতে চায় না?'

'তা জানি না, তবে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়াতেই দেখি তারা সব ভিড় করে আমাকে ঘিরে ধরল এমনভাবে যে ফোকাসই করতে পারলাম না।'

'একটু পিছিয়ে এলে না কেন?'

'তাও চেষ্টা করে দেখেছি,' বললেন মার্ডেন। 'আমি যত পিছোই, তারাও ততই এগিয়ে আসে। ছবি তোলা খুবই মুশকিল হবে হে।'

'ঠিক আছে,' বললেন ডুগান, 'চলো, সবাই আগে ওদের সঙ্গে আলাপ করে আসি। খাবারের থলিটা নিতে ভুলো না। তাতেই ওরা খুশি হবে।'

সবাই ওঁরা নেমে পড়লেন জলে ডুবুরীর পোশাক পরে। সত্যি এত স্বচ্ছ জল যে অনেক দূর অবধি পরিষ্কার দেখা যায়।

জলে নামতেই মাছেরা সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের ঘিরে ফেললো। কত রকম যে রঙ আর চেহারা সেই সব মাছেদের তা আর বলে শেষ করা যাবে না। ওঁদের ঘিরে তারা কিলকিল করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেমন স্বচ্ছন্দ গতি, তেমনি সহজ আনন্দ। মার্ডেন তাঁর থলি থেকে খাবার বার করে ওদের খেতে দিলেন। মাছেরা সেই খাবার খায় আর মার্ডেনের পায়ে আলতোভাবে ল্যাজ আর পাখনার চাপড় মারে। ভারি খুশি খুশি মন তাদের। হাঁ করে খায়, জুলজুল করে দেখে আর যেন নেচে নেচে ঘোরে।

এমন সময় হঠাৎ ওঁরা দেখা পেলেন একটা বেশ বড়সড় আকারের মাছের। মাছটা মার্ডেনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার ওজন হবে প্রায় পঁচিশ কেজি। গায়ের রঙটা যে কী তা সঠিক বলা শক্ত। কখনো খয়েরী, কখনো নীল, আবার কখনো কালো। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে। ব্যাপার দেখে ওর নাম রাখা হলো বহুরূপী।

ডেলমাস ওর ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হতেই ও ক্যামেরায় মারল একটা ধাক্কা। ডেলমাস চট করে পিছিয়ে গিয়ে কোনোরকমে ওর একটা ছবি তুলে নিলেন।

বাস্, বহুরূপী আর ডেলমাসকে ছাড়ে না। সারাটা দিন তাঁর

সংগে সংগেই ঘুরে বেড়ালো। বেশ অনেকক্ষণ ছবিও নিতে দিল। ঐ একদিনেই বহুরূপীর সংগে সকলের বেশ ভাব হয়ে গেল। জল থেকে ওঠার সময় বহুরূপী ওঁদের জাহাজের সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিলে।

পরের দিন জলে নামতে গিয়ে ওঁরা অবাক হয়ে দেখলেন বহুরূপী অনেক আগে থেকেই সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। সবাইকে আসতে দেখে তার আনন্দ যেন আর ধরে না। ওঁদের দেখেই সে দু-চারটে ডিগবাজী খেয়ে নিল। গোটা কয়েক ঢুঁ মারলো ওঁদের গায়ে। সেই সংগে কয়েকটা ঘাইও দিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ একটা কান্ড করে বসলো বহুরূপী। মার্ডেন যেই না জলে নেমেছেন অমনি সে তাঁর হাতের খাবারের থলিটা এক হ্যাঁচকায় ছিনিয়ে নিয়ে কপ করে গিলে ফেললো। মার্ডেন তো চটেই লাল। দু-চারটে চড়চাপড়ও মারলেন বহুরূপীকে। ও কিন্তু কিছুই বললো না। সেদিনও বহুরূপী অনেক ছবি নিতে দিল। কাজের শেষে সেদিনও সবাইকে জাহাজ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

পরের দিন কিন্তু বহুরূপীকে আর দেখা গেল না কোথাও। ওই তো তখন ছবির নায়ক। আর নায়ককে বাদ দিয়ে ছবি তোলার কোনো মানে হয়! অতএব ক্যামেরা বন্ধ রেখে ওঁরা ওকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

অবশেষে পাওয়া গেল তাকে। জলের নিচে একটা ডুবো পাহাড়ের খাঁজে ও শুয়ে আছে চুপটি করে। ওঁদের দেখেও সে একটুও নড়লো না।

মৎস্য-চিকিৎসক ডেনিস এগিয়ে এসে বহুরূপীকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, 'ও রীতিমতো অসুস্থ। এখনি অপারেশন করতে হবে।'

'সে কি কথা।' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন সকলে।

ডেনিস জাহাজ থেকে ছুরি কাঁচি নিয়ে এসে সত্যি সত্যি অপারেশন করলেন। অন্যেরা ওঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন।

বহুরূপীর পেট থেকে ডাক্তার যে বস্তুটি বার করলেন সেটি কি বুঝতে পারছ? হ্যাঁ, আগের দিন গিলে খাওয়া মাছের জন্য খাবারের সেই থলিটি। ওকে বিশ্রাম করতে দিয়ে সবাই ফিরে এলেন জাহাজে।

পরের দিন ভোর হবার অনেক আগেই শোনা গেল জাহাজের গায়ে কে যেন ঝাপটা মারছে। ডেকের ওপর বেরিয়ে এলেন সবাই। অবাক হয়ে দেখলেন ওটা বহুরূপীরই কান্ড। আর ওঁদের দেখে বহুরূপী আহ্লাদে আনন্দে যেন ডগমগ। দু-চারটে ডিগবাজী খেয়ে সে এমন একটি তুড়িলাফ মারলো যে ডাক্তার ডেনিস সরে না এলে তাঁর বুকের ওপর এসে আছড়ে পড়তো।

'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ডাক্তার', বললেন পরিচালক। 'তোমারই চেষ্টায় ও ভালো হয়ে গেছে। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে।'

'কত মানুষ রোগী ভালো করলুম', বললেন ডাক্তার, 'কেউ একদিনও এলো না কৃতজ্ঞতা জানাতে। আর একটা মাছ এসেছে তার ধন্যবাদ জানাতে!' ভাবতে চোখে জল আসে ডেনিসের।

মার্ডেন বললেন, ইচ্ছে হচ্ছে ওকে আমাদের জাহাজে করে দেশে নিয়ে যাই ডেকে বলি মানুষগুলোকে যে, মাছ হলেও এ তোমাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়।'

'ওর দেহটাই নিয়ে যাওয়া যাবে', পরিচালক ডুগান বললেন, 'মনটা যাবে না। জন্মভূমি ছেড়ে যেতে কারোর ভালো লাগে? তুমিই বলো?'

'ও এখানেই আনন্দে থাক।' ডেলমাস বললেন, 'আমরা মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাব।'

'সেই ভালো,' বললেন সবাই।

শুনলে অবাক হবে, এর পরে যে-সব অভিযাত্রীরা এই প্রবাল দ্বীপে এসেছে, বহুরূপীর সংগে তাদের সকলেরই বেশ ভাব হয়ে গেছে।

'দি সাইলেন্ট ওয়ার্ল্ড' ছবিটিতে দেখা গেছে বহুরূপীকে। তার সুন্দর নধর দেহ, তার আনন্দ-উচ্ছল নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করেছে।

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

ডাক্তার নরুদার চ্যালেঞ্জ

অজেয় রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরেদিন খুব ভোরে বেরিয়ে অজিত হাজির হলো নদীর ওপারে পাহাড়ের কোলে এক গ্রামে যেদিক থেকে গতকাল সন্ন্যাসীকে আসতে দেখেছিল।

অজিত খোঁজ করল, 'কাল কি এক সাধু এসেছিলেন এই গাঁয়ে?'

'আজ্ঞে হাঁ,' জানায় গ্রামবাসী, 'দুপুরে এসে বিকেলে চলে যান।'

'কি করলেন তিনি?'

'ওই হরেরামের বাড়ির দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করলেন। গাঁয়ের অনেকে গিয়েছিল দর্শন পেতে।'

'হরেরামের বাড়িতে গেলেন কেন?'

'ওই তো সাধুবাবার সেবা করতে ওঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। সাধুজী প্রথমে গ্রামে ঢোকেননি। উনি নাকি চলে যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে। হরেরাম ডেকে আনে।'

'এই সাধুকে আগে দেখেছ?'

'হাঁ, দেখেছি কয়েক মাস আগে। তবে এ গাঁয়ে ঢোকেননি।'

অজিত হরেরামের বাড়ি খুঁজে হাজির হয়।

হরেরাম বছর তিরিশের জোয়ান পুরুষ। ধুতি পরে খালি গায়ে তার কুঁড়েঘরের আঙিনায় বসে শণের দড়ি পাকাচ্ছিল। কাছেই খেলা করছিল বছর পাঁচেকের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গোলগাল একটি মেয়ে। অজিতের আগমনে বিস্মিত হরেরাম উঠে দাঁড়ায়।

'তোমার নাম হরেরাম?' জিজ্ঞেস করে অজিত।

'আজ্ঞে।'

'তোমার বাড়ি এক সাধুবাবা এসেছিলেন কাল?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'সাধুবাবা তোমার বাড়িতে এলেন কেন?'

'সাধু চলে যাচ্ছিলেন গাঁয়ের পাশ দিয়ে। আমি তখন মেয়েকে নিয়ে আসছি। সাধুবাবাকে পেন্নাম জানালাম। সাধুবাবা তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'চল তোমার বাড়ি গিয়ে বসি একটুক্ষণ। আমার এই মেয়েটাকে ভারি জব্বর বর দিয়েছেন সাধু। বলেছেন সৌভাগ্যবতী হবে, রূপবতী হবে।'

'বেশ, বেশ। এই সাধু থাকেন কোথায়?'

'তা জানি না। গাঁয়ের পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওই ধারে যেতে দেখেছি আগে দুবার। তবে এ গাঁয়ে ঢোকেননি।'

'সাধু সেবা-টেবা, মানে কিছু প্রণামী নিলেন?'

'আজ্ঞে না। দিতে চেয়েছিলাম চাল ভুট্টা। সাধুজী কিছু নিলেন না। যারা দেখা করতে এসেছিল আশীর্বাদ করলেন তাদের। আচ্ছা আচ্ছা উপদেশ দিলেন। আমার সঙ্গে বলেছেন পরে দেখা করবেন।'

স্কুলে দেরি হয়ে যাচ্ছিল তাই এবার ফিরল অজিত। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে এখন আর অনুসন্ধান চালিয়ে লাভ আছে মনে হলো না। ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে গেল। ডাঃ ঘোষ কি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঘোরেন? কিন্তু কেন? পাহাড়ের ওধারে গ্রামগুলোয় যেতে হবে সময় পেলে। সন্ন্যাসীটির সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে।

॥ ১০ ॥

ল্যাবরেটরিতে গোপনে ঢুকে ডাঃ দত্তর রিসার্চ পেপার্স হাঁটকাবার বা সেই হলুদ রঙা ট্যাবলেটের স্যাম্পল যোগাড় করার সুযোগ পাচ্ছে না অজিত। দিন সাতেক কেটে গেল। আর তারপরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সমস্ত ব্যাপারটা বিচিত্র নতুন পথে মোড় নিল।

স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরছে অজিত। একা একা হাঁটছে পথে। সহসা একটি লোক তার পাশে এসে জুটল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম অজিত রায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অজিত। লোকটিকে আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো না। লোকটি গাঁট্টাগোট্টা। মাঝারি হাইট। চোয়াড়ে মুখে মোটা ঝুলো গোঁফ। রং কালো। পরনে ফুলপ্যান্ট, শার্ট ও হাফ-সোয়েটার। তাকে এক ঝলক নজর করে অজিত মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা পিন্টুবাবু এসেচে এখানে?'

পিন্টু অজিতের ভাগনের ডাকনাম। ওর ভাল নাম কমল। অজিতের বিধবা দিদির বড় ছেলে। এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। একটি ছোট বোন আছে পিন্টুর। সে পড়ে স্কুলে। দিদি একটা মেয়েদের স্কুলে পড়ান। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে দিদির। পিন্টুকে খুব ভালবাসে অজিত। ডানপিটে ফুর্তিবাজ স্বভাব। ভাল ফুটবল খেলে। অজিত বলল, 'কৈ পিন্টু তো আসেনি।'

'ঠিক বলচেন?'

অপরিচিত লোকটার রুক্ষ কথার ভঙ্গিতে চটে গেল অজিত। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কে আপনি?'

'সে আমি যেই হই। মানে পিন্টুবাবুর চেনা লোক। তাহলে পিন্টুবাবু আসেনি?' উদ্ধত গলায় উত্তর হয়।

'না, আসেনি। বলছি তো,' অজিত কড়া সুরে বলে, 'পিন্টুর সঙ্গে আপনার কি দরকার?'

'দরকার আছে বৈকি।' লোকটা সঙ্গ ছাড়ে না। পাশে যেতে যেতে বলে, 'পিন্টুবাবুর চিঠি পেয়েছেন কোনো?'

'না। অনেকদিন ওর চিঠিপত্র পাইনি।'

নিজের বাসার দরজায় পৌঁছয় অজিত। লোকটার ব্যবহারে মনে রাগ ও অস্বস্তি জমে। বাসায় ঢোকার আগে লোকটিকে বলে, 'মনে হচ্ছে আমার কথায় বিশ্বাস হয়নি। ভিতরে এসে দেখতে পারেন পিন্টু এখানে আছে কিনা। কি ব্যাপার বলুন তো? পিন্টুর কি এখানে আসার কথা ছিল?'

'হুঁম।' লোকটা কোনো জবাব না দিয়ে পিছু ফিরে হনহন করে হেঁটে অদৃশ্য হলো পথের বাঁকে।

অজিত রীতিমত অবাক। পিন্টুর চেনা এ লোকটা কে? এদ্দূর এসেছে পিন্টুর খোঁজে অথচ সে তো এমন কোনো সম্ভাবনার কথা জানে না। কোনো চিঠিও পায়নি। পিন্টু কি বরানগরে নেই! কোথাও গেছে বাড়িতে না বলে? লোকটাকে কেমন সুবিধের মনে হলো না।

দু'দিন বাদে স্কুল শেষে বাসায় ফিরে অজিত চমকে উঠল। ওর ঘরের সামনে সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিন্টু। তার কাঁধে একটা কিট-ব্যাগ।

'আরে পিন্টু, তুই হঠাৎ!'

পিন্টু জবাব না দিয়ে একটু হাসে। কেমন ম্লান হাসিটি।

'কতক্ষণ এসেছিস? আয় ঘরে আয়। বাড়ির সব ভাল তো?'

অজিত বন্ধ দরজার তালা খোলে। পিন্টু ভেতরে ঢুকতে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। কাঁধের ব্যাগ মাটিতে রেখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে পিন্টু। তাকে দেখে মনে হয় খুব ক্লান্ত।

'বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি তো? কতবার বলেছি আসতে। সেই এলি, একটা চিঠি দিয়ে এলে স্টেশনে থাকতাম। চারটের ট্রেনটায় এলি বুঝি?'

পিন্টুর আগমনে উল্লসিত অজিতের কথার স্রোত সহসা থমকে যায় পিন্টুর ভাব দেখে। পিন্টু কেমন বিষণ্ণ মনমরা। অজিতের উচ্ছ্বাস তাকে স্পর্শ করছে না যেন। অজিত থামতেই পিন্টু ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে, 'খোকামামা, তোমার এখানে ক'দিন থাকতে পারব লুকিয়ে?'

'লুকিয়ে! কেন রে? কি ব্যাপার?' অজিত থ।

'মামা, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নইলে খুন হয়ে যাব।'

'খুন! সেকি! কি হয়েছে বল্ তো?'

'জল আছে খাবার?'

কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিতে পুরো এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে নিয়ে খানিক চুপ করে থাকে পিন্টু। তারপর ধীরে ধীরে যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয় তার সারমর্ম এই ঃ

পিন্টুদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত কলেজে, নাম দুলাল ঘোষ। তার দেশ মেদিনীপুরের এক গণ্ডগ্রামে। রোগা চেহারা। লাজুক প্রকৃতির। কলকাতায় এক সস্তা মেসে থাকত

গাড়ির ভেতর থেকে ছুটে আসে গুলি।

সে। বাড়ি থেকে সামান্য টাকা আসত। আর কিছু টিউশনি করে দুলাল কোনোরকমে নিজের খরচ চালাত। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল দুলাল। অনেকেই আশা করত সে ইতিহাস অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাবে। পিন্টুর সংগে দুলালের বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। মুখচোরা চাপা স্বভাবের দুলাল ক্লাসে আর কারও সংগে তেমন অন্তরংগ না হতে পারলেও পিন্টুকে তার নিজের অনেক কথা বলত অকপটে। পিন্টুকে পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করত দুলাল। ওর মেসে মাঝে মাঝে যেত পিন্টু।

থার্ড ইয়ারের মাঝমাঝি হঠাৎ দুলাল ক্লাস কামাই শুরু করে। কখনো কখনো কলেজেই আসত না। কখনো বা দেরি করে আসত। ওর চেহারাটাও বড্ড খারাপ হয়ে যায়। সদা যেন মনমরা ক্লান্ত ভাব। কোনো অসুখ হয়েছে নাকি ? পিন্টু তাকে একদিন চেপে ধরে। দুলাল তখন বলে এক মর্মান্তিক কাহিনী। সে নাকি এক সর্বনাশা নেশার খপ্পরে পড়েছে। হেরোইনের বিষে সে তখন জর্জরিত। দেহমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। পরিত্রাণের বুঝি কোনো উপায় নেই।

দুলালের মতন নিরীহ সরল পড়ুয়া ছেলে কিভাবে হেরোইনের কবলে পড়ল! দুলালের মুখে সে কাহিনী শুনে পিন্টু স্তম্ভিত হয়।

দুলালদের মেসে বলাই সামন্ত নামে একটি নতুন লোক এসে ছিল কিছুদিন। সে নাকি দালালি করে। অতি সপ্রতিভ। মেসে সবার সংগে তার ভাব হয়ে যায়। দুলালের সংগেও।

দুলালের অভ্যেস ছিল পান খাওয়া। বলাই সামন্তও পান খেত। চা সিগারেট দোক্তা সুগন্ধি মশলা-পান সবই চলত তার ঘনঘন। সামন্ত প্রায়ই দুলালকে পান অফার করত নিজের ডিবে থেকে। সেই পান খেলেই দুলালের শরীরে কেমন এক আরামদায়ক অনুভূতি হতো। দেহমন চনমনে লাগত। বলাই সামন্ত বলত, মশলার গুণ। এই পান নাকি সে একটা বিশেষ দোকান থেকে কেনে। তার স্পেশাল পান বানিয়ে দেয় দোকানে। আসলে অতি সামান্য পরিমাণে নেশার দ্রব্য হেরোইন পানের মশলায় মেশানো থাকায় এই বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি।

ক্রমে দুলাল, সামন্তর দেওয়া পানের বশীভূত হয়ে পড়ে। হা-পিত্যেস করে থাকত কখন সামন্তবাবু ওই স্পেশাল মশলা দেওয়া পান খাওয়াবে। সামন্তর দেওয়া পান খাওয়ার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এইভাবে দুলাল নিজের অজান্তেই এই মারাত্মক নেশার দাস হয়ে পড়ে। ওইরকম মশলা দেওয়া পান দিনে বার কয়েক না খেলে তার শরীর-মন ঝিমিয়ে পড়ত।

বলাই সামন্ত মাসখানেক বাদে মেস ছেড়ে দেয়। তবে দুলালের সংগে তার যোগাযোগ থাকে। যে দোকানে ওইরকম স্পেশাল মশলা দেওয়া পান পাওয়া যায় সেই দোকানটা দুলালকে চিনিয়ে দিয়েছিল সামন্ত। আর তাকে নিয়ে গিয়েছিল রাজাবাজারে এক গোপন আড্ডায়। সেখানে তাস দাবা ইত্যাদি খেলাগুলো ছিল বাইরের আবরণ।

আড্ডাধারীদের আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে চা পান সিগারেট প্রভৃতির মাধ্যমে নানারকম নেশার বস্তু সেবন। মাসখানেক পর থেকে বলাই সামন্ত আর নিজের গাঁটের পয়সায় দুলালকে ওই স্পেশাল পান খাওয়াতে রাজী হতো না। ফলে চড়া দামে দুলালকে কিনতে হতো অমনি নেশা-ধরানো পান।

দুলাল তখন জানতে পেরেছে যে ওই পানের মশলায় হেরোইন আছে। কিন্তু জানলেও সেই নেশার আকর্ষণ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আত্মগ্লানি ও নেশার প্রভাবে সে দিনে দিনে হয়ে পড়ছিল অবসন্ন মনমরা। পড়াশুনা নষ্ট হচ্ছে। খরচে কুলতে পারছে না। লজ্জায় ভয়ে এ বিষয়ে কাউকে বলার সাহসও নেই। ওই মেসের আর একটি যুবকও পড়েছিল বলাই সামন্তর খপ্পরে। আসলে সামন্ত মাদক দ্রব্য বিক্রেতাদের দলের লোক। এই কৌশলে তাদের গ্যাং অনেক সময় মানুষজনকে নেশার দাস করায়। তাদের কাছে নেশার দ্রব্য বিক্রির সুযোগ তৈরি করে।

পিন্টুর জেরার মুখে দুলাল স্বীকার করেছিল নিজের অধঃপতনের কাহিনী। পিন্টু তাকে উৎসাহ দিয়েছিল, মনের জোরে এই নেশার বাঁধন কাটিয়ে উঠতে। কয়েক মাস প্রাণপণ চেষ্টায় নেশা করা প্রায় ত্যাগ করেছিল দুলাল। সে অনেকটা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এরপর ফাইনাল পরীক্ষা এসে যায়। পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে পিন্টু। ক্লাস বন্ধ। ফলে দুলালের সঙ্গে রোজ দেখা হতো না। ওর খোঁজখবরও বেশি পেত না। কয়েকবার ওর মেসে গিয়েছে। ওর মুখে শ্রান্তভাব লক্ষ্য করেছে। তখন ভেবেছে যে পড়ার চাপই এর কারণ। দুর্বলচিত্ত দুলাল যে বলাই সামন্তর প্রভাবে পড়ে আবার নেশার জগতে ফিরে গেছে তা ধরতে পারেনি। দুলালও লজ্জায় সেকথা বলেনি তাকে।

দুলাল পরীক্ষা দিতে এল না। দুটো পেপার হয়ে যাবার পর ওর খোঁজে মেসে গিয়ে পিন্টু শোনে যে অনেক পাওনা বাকি পড়ায় সে মেস ছেড়ে দিয়েছে। থাকে কালীঘাটে এক বস্তিতে। কোনো চিঠি এলে রিডাইরেক্ট করার জন্য ঠিকানাটা রেখে গেছে। অনেক খুঁজে সেই বস্তিতে গিয়ে পিন্টু দেখে দুলালের অবস্থা শোচনীয়। শরীরে মনে একেবারে সে ভেঙে পড়েছে।

পিন্টুর দেওয়া চিঠি পেয়ে দুলালের বাড়ির লোকেরা এল। কিন্তু দুলালকে দেশে নিয়ে যাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। দুলাল এরপর আত্মহত্যা করতে যায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে। সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলেও তার কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল দেখা দেয়। দুলালের বাবা জমি বেচে অনেক কষ্টে দুলালের চিকিৎসা করছেন ওকে একটা মেনটাল হসপিটালে রেখে। ডাক্তার বলেছেন যে দুলাল আবার পুরোপুরি সুস্থ হতে বেশ সময় লাগবে।

দুলালের পরিণতি দেখে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয় পিন্টু। সে জানত কোন পানের দোকান দুলালকে নেশার বস্তু যোগাত। সেই দোকানের ওপর সে গোপনে নজর রাখে। একদিন দেখতে পায় যে দুলালের মেসের সেই বলাই সামন্ত ওখান থেকে পান কিনছে। লোকটার পিছু নিয়ে ওর ডেরাটা জেনে ফেলে পিন্টু। সামন্তকে সে চিনত। একদিন দুলালের মেসে দেখেছিল ওকে। নামটাও শুনেছিল তখন। রাজাবাজারে যে নেশার আড্ডায় দুলালকে নিয়ে যেত বলাই সামন্ত সেই ঠিকানাটাও বলেছিল দুলাল। বস্তি টাইপের সেই বাড়িটার পাশ দিয়ে বার কয়েক যাতায়াত করে পিন্টু দেখে নেয় নেশাখোরদের আড্ডাটা। এরপর পিন্টু লালবাজারে গিয়ে গোপনে পুলিশকে জানিয়ে আসে নেশার কারবারীদের কীর্তিকলাপ ও হদিস। দুলালের বাবাকে সে বলেছিল পুলিশে খবর দিতে কিন্তু ভদ্রলোক সাহস পাননি গুন্ডা-বদমাশদের ঘাঁটাতে।

পুলিশ সেই পান-সিগারেটের দোকান এবং রাজাবাজারে নেশার আড্ডায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করে কয়েকজনকে। প্রচুর নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্যও উদ্ধার হয়। বলাই সামন্তকে কিন্তু ধরতে পারেনি পুলিশ। সে গা-ঢাকা দেয়।

সামন্তর গ্যাং কিভাবে জেনে যায় পিন্টুর কীর্তি। কয়েকদিনের মধ্যেই পিন্টুর ওপর আক্রমণ হয়। অল্পের জন্য পিন্টু বেঁচে যায় প্রাণে।

সন্ধ্যে নাগাদ পিন্টু বাড়ি ফিরছে। তার বাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা মোটর। গাড়ির কাছাকাছি আসতেই গাড়ির ভিতর থেকে ছুটে আসে পিস্তলের গুলি পিন্টুকে লক্ষ্য করে। একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

গুলির শব্দে চমকে ফিরে পিন্টু দেখে গাড়িটার জানলায় উদ্যত পিস্তলের নলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এবং দুটো মুখ। একটা মুখ বলাই সামন্তর। পিন্টু দৌড় দেয় প্রাণপণে। হৈ হৈ করে আসে পাড়ার লোক। মুহূর্তে গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে তীব্রগতিতে উধাও হয়।

পিন্টু নিশ্চিত বুঝতে পারে যে সামন্তর গ্যাং তাকে খুন করার চেষ্টা করছে। আবার ওরা আঘাত হানবে। হয়তো প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। অথবা যাতে কোর্টে কেস উঠলে পিন্টু সাক্ষী দিতে না পারে তাই তাকে খতম করার মতলব। এরপরই পিন্টু কলকাতা ছেড়ে পালায় ভয়ে। মাকে অল্প একটু আভাস দিয়ে এসেছে তার বিপদের।

পিন্টু মাসখানেক ধরে নানান আত্মীয় ও চেনা লোকের বাড়িতে দু-চার দিন করে কাটিয়ে খোকামামা অর্থাৎ অজিতের কাছে হাজির হয়েছে অবশেষে। সম্বল পয়সা প্রায় নিঃশেষিত। তা ভিন্ন এই দুর্ভাবনার চাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে। একমাত্র খোকামামাকে সে খুলে বলতে পারে ব্যাপারটা। এইখানে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা হয়তো সম্ভব। কিংবা অন্য কোনো পরামর্শ যদি দিতে পারে মামা।

(চলবে)

ছবি : বিজন কর্মকার

শকুন্তলার টিকি

দীপঙ্কর বিশ্বাস

বাংলা ভাষায়, দেওয়াল কথাটা ভারি ভালো। ইংরিজিতে ট্রানস্লেট করার জন্য মোটেই খাটতে হয় না। সামনের "দে" শব্দটা তুলে দিলেই দিব্যি ইংরিজি হয়ে যায় wall। সব বাংলা কথাগুলো যদি এমন ভদ্র হতো তাহলে আর আমাদের ট্রানস্লেশন নিয়ে অতো হিমশিম খেতে হতো না। টিফিনের সময় আলুর দম-মাখা আঙুল চাটতে চাটতে হরিকে আমার এই নতুন উপলব্ধির কথা বোঝাচ্ছিলাম। হরি একমুখ ডিমসেদ্ধ নিয়ে হুঁ হাঁ করে আমার কথায় সায় দিচ্ছিল। পাশে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে হাই-বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে স্বপন একমনে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়ে, পড়তে পড়তে কোনোওরকমে টাল সামলালো।

'দারুণ মনে করিয়ে দিয়েছিস তো। আমি একদম ভুলেই গেছলাম।'

আমরা অবাক হলাম, 'তোকে আবার কি মনে করালাম?'

'একটা দারুণ জিনিস। সেজমাসির বাড়ি থেকে শিখে এসেছি।'

'কি?'

'কি করে যে ভুলে গেলাম!'

'আরে বলবি তো কি?'

'তোর দেওয়ালের কথায় মনে পড়ে গেল।'

'কি? চুনকাম করা?'

'তোর যেমন বুদ্ধি। কিন্তু কি করে যে ভুলে গেলাম!'

'বলবি তো বল, না হলে চুপ কর।'

'দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা। ইস্কুলে একটা দেওয়াল পত্রিকা বার করলে কেমন হয় বল তো?'

আমি আর হরি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। দেওয়াল পত্রিকা আমরাও দেখেছি, কিন্তু ইস্কুলে বার করার কথা কখনও মাথায় আসেনি। বললাম, 'ক্লাসের অন্যরা আসুক, একটু আলোচনা করে দেখা যাক।'

ছুটির পর ক্লাসের অনেকে মিলে দেওয়াল পত্রিকা কথাটা আলোচনা করলাম। অনেকেরই মত আছে। জগন্নাথ অর্থাৎ জগা আমাদের ফার্স্ট বয়। আমরা জগাকে বললাম তুই থাকলে খুব সুবিধে হয়, ভাষাটাষা, বানান-টানান নিয়ে তাহলে কম ভাবতে হয়।

জগা বলল, 'আমার আপত্তি নেই কিন্তু হেডস্যার কি মত দেবেন?'

আমরা বললাম, 'বলে দেখতে তো দোষ নেই।'

নয়ন বলল, 'তাহলে এখনই চল। এই সময় হেডস্যার একটু

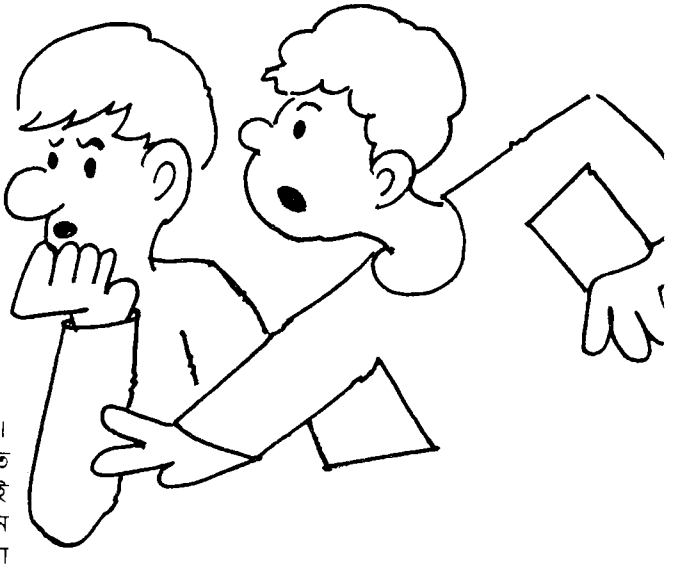

নিরিবিলিতে ঠান্ডা মেজাজে থাকেন।'

হরি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'বললেই হলো। গত সাত বছরে হেডস্যারের ঠান্ডা মেজাজ কে দেখেছে রে?'

সত্যিই আমরা হেডস্যারকে ঠান্ডা মেজাজে কখনও থাকতে দেখিনি!

নয়ন বলল, 'তোরা এই সময়ে হেডস্যারকে কবে দেখেছিস? আমরা খেলাধুলোর জন্য বেশিক্ষণ থাকি বলেই দেখতে পাই। গত বছর সরস্বতী পুজোর সময়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি। চাঁদা নিতে যারা এসেছিল, সকলে এক টাকা করে পেল। খালি এই সময়টাতে যারা এসেছিল তারা ছাড়া, তারা দু-টাকা করে পেয়েছিল।'

নয়নের কথাগুলো আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও গুটি গুটি রওনা হলাম। হেডস্যারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, কে

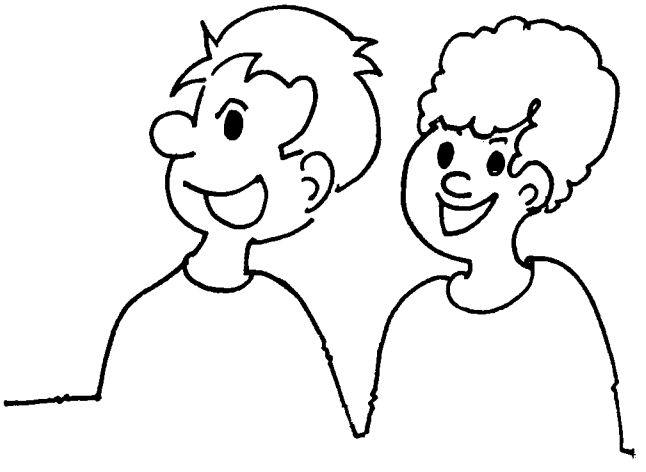

আগে ঢুকবে তা নিয়ে ঠেলাঠেলি চলছিল, হেডস্যার নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কারা ?'

অগত্যা, 'আমরা স্যার' বলে জনা পাঁচছয় হেডস্যারের ঘরে সেঁধিয়ে পড়লাম। বাকিরা বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকলো।

টেবিলের ওপর একরাশ পরীক্ষার খাতা ছড়ানো। খাতা থেকে মুখ তুলে একটু মুচকি হাসলেন হেডস্যার, 'বলে ফেল কি বলবে।'

আমরা হতবাক! হেডস্যারের মেজাজ সত্যিই ভালো!! এমনটা তো কক্ষণো দেখিনি!

হরি আমার কানে কানে বলল, 'নির্ঘাৎ অনেকগুলো গোল্লা পেয়েছে রে।'

জগা ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ওর ওপরেই ভার হেডস্যারের কাছে কথাটা পাড়ার। জগা বিশেষ ভণিতা না করে কথাটা পেড়ে ফেলল। আমরা যথাসম্ভব গোবেচারা গোবেচারা মুখ করে কান-টান চুলকোতে থাকলাম। দেওয়াল পত্রিকার কথা শুনে হেডস্যার একটু ভুরু কুঁচকে চেয়ারে হেলান দিলেন। আমরা দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকলাম। এক্ষুণি হয়তো বলবেন, 'না! ওসবে পড়ার ক্ষতি হবে।'

'সে তো খুব ভালো কথা। আমিও কদিন আগেই ভাবছিলাম, ইস্কুলে এরকম একটা পত্রপত্রিকা বার করার কথা। তা, তোমরা পারবে ?' হেডস্যারের মুখে মৃদু হাসি।

নিজের কানকে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হলো পায়ের নিচের মাটিটা একবার টাল খেল। কেমন যেন নার্ভাস লাগলো।

সাধে কি আর ফার্স্ট বয়। কি শক্ত নার্ভ রে বাবা। আমরা চক্কোর কাটার আগেই শুনতে পেলাম, জগা গড়গড় করে বলে যাচ্ছে, কিছু ভাববেন না স্যার, এমন দেওয়াল পত্রিকা বার করবো যে সকলের তাক লেগে যাবে। একটা কাঠের ফ্রেম তৈরি করাতে হবে। পেছন দিকটা দেওয়ালে ভালো করে আটকানো থাকবে। সামনে থাকবে একটা তারের জাল লাগানো দরজা। দুটো আলো লাগানোর ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে রাত্তিরেও সকলে পড়তে পারে।'

হেডস্যার বললেন, 'ওটা কিন্তু ক্লাসরুমের সামনে দেওয়ালে লাগানো চলবে না। তাহলে ছেলেরা ক্লাসের ফাঁকে ভিড় করবে। মেন গেটের কাছে দারোয়ানদের ঘরের সামনে যে টিনের শেডওলা দাওয়া আছে সেখানে লাগাবে। তা কি ধরনের লেখা থাকবে ? ভেবেছ কিছু ?'

জগা গড়গড় করে বলে গেল, 'গল্প, কবিতা, ছবি, রচনা, খেলাধূলা সবকিছুই থাকবে। ইস্কুলে সব ধরনের লোকই আছে।'

জগাকে আমরা সম্পাদক করে দিলাম। ওই সব বানান-টানানের ঝামেলায় কে ঢুকবে! তা ছাড়া জগার হাতের লেখাটাও খাসা। দেওয়াল পত্রিকার উপযুক্ত। জগাও এক কথায় রাজী। আমরা ছজনে মিলে একটা সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি করলাম, যাদের কাজ হবে সম্পাদককে সাহায্য করা। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 'দিগন্ত' নামটাই সকলের পছন্দ হলো।

পরের দিনই আমরা ক্লাসে ক্লাসে জানিয়ে দিলাম দেওয়াল পত্রিকার কথা। মাসে মাসে বেরোবে। সকলে যেন সাধ্যমত লেখা আঁকা জমা দেয়। অবশ্য মনোনয়নের অধিকার একান্তই সম্পাদকমণ্ডলীর। একটা কাঠের ফ্রেম, ঠিক যেমনটি দরকার ছুতোরের কাছে অর্ডারও দেওয়া হলো।

দেওয়াল পত্রিকার প্রস্তুতি বেশ ভালই এগোচ্ছিল। শুধু নিতাই একদিন একটা ব্যাগড়া তুলে বসল। বলল, 'আমি অনেক দেওয়াল পত্রিকা দেখেছি। সব পত্রিকাতেই গল্প, কবিতা, ছবিটবিগুলোকে অনেক কষ্টে পাশ কাটিয়ে একটা লতানে পদ্মফুলের গাছ বাঁদিক ঘেঁষে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত উঠে যায়। ওটা কিন্তু আমাকে আঁকতে দিতে হবে।'

নিতাই সকলের বন্ধু হলেও সম্পাদকমণ্ডলী হাঁ হাঁ করে উঠলো, 'তুমি সেবার বুদ্ধ জয়ন্তীতে বুদ্ধদেবের ছবি এঁকে ক্লাসসুদ্ধ সকলকে যা বকুনি খাইয়েছিলে, তোমাকে আমরা আর আঁকতে দিচ্ছি না। অন্য অনেক কিছুই তো করার আছে করো না। কেউ তো আপত্তি করেনি।'

নিতাই কিন্তু নাছোড়, 'দেওয়াল পত্রিকার নামের দু-পাশে দুটো আলপনা দেওয়া, বড় সাইজের শাঁখ থাকে, সেগুলো আঁকতে দে। তাও না দিস তো ডানদিকের কোণে যে এক সার বক উড়ে যায় সেগুলো অন্তত আঁকতে দে।'

সম্পাদকমণ্ডলী কিন্তু অনড়।

নিতাই প্রথমটা গুম মেরে বসে রইল তারপর বলল, "বয়ে গেছে তোদের বাংলা পত্রিকায় আঁকতে। ক্লাস টেনের মদনদারা একটা ইংরিজি wall magazine বার করছে, তাতেই আঁকবো।' বলেই গটগট করে চলে গেল।

আমরা তখনই বুঝলাম, ক্লাস নাইনের দেখাদেখি ক্লাস টেনের ছেলেরাও একটা দেওয়াল পত্রিকা বার করছে! হেডস্যার নির্ঘাৎ আপত্তি তুলেছিলেন দ্বিতীয় পত্রিকার, তাই অনুমতি পেতে ইংরিজি করতে হয়েছে।

জগা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতো সব ইংরিজিতে পণ্ডিত তা জানা আছে।'

নিমে বলল, 'ওদের ছবিটবিগুলো আঁকা কিন্তু অনেক সহজ। সাহেব আঁকতে হলে প্রথমেই কোট আর টাই পরিয়ে দাও, তাতে পছন্দ না হলে একটা ফেল্ট হ্যাট, আর তাও যদি বেমানান লাগে, তাহলে একটা দাড়ি। ব্যস, হয়ে গেল। তলায় নাম বসিয়ে দাও। কে চিনতে যাচ্ছে কোন সাহেব। আমাদেরটা অনেক শক্ত। বুদ্ধ জয়ন্তীতে বুদ্ধদেব আঁকলে, বুদ্ধদেবের মতন দেখতে হতেই হবে, না হলে সক্কলে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে।'

প্রচুর লেখা আঁকা জমা পড়তে লাগলো। আমরা ভাবতেই পারিনি যে স্কুলে এত প্রতিভা আছে। অবশ্য গদ্যকারের চেয়ে পদ্যকারের সংখ্যা অনেক বেশি। 'দিগন্তের' প্রথম সংখ্যার জন্য যে সমস্ত লেখা ও আঁকা মনোনীত হলো তার একটা ফর্দ দিচ্ছি। একটা ছোট গল্প, গোটা পাঁচেক ছবি, যার একটা নিমের আঁকা। খুব সুন্দর। শকুন্তলা হরিণকে কি যেন খাওয়াচ্ছেন। একটা শব্দজব্দ। পনেরো লাইনের মতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। কিছু চাঞ্চল্যকর খেলার খবর। একটা প্রবন্ধ, হাতী কি ডাইনোসরের বংশধর ? গোটা ছয়েক ছোট কবিতা, যার গোটা দুয়েক তুলে দিচ্ছি, তোমরা খানিক স্বাদ পাবে। এ

ছাড়া অনেক কাগজ হাতড়ে জগার লেখা, বর্ষার উপযুক্ত একটা দারুণ সম্পাদকীয়।

বলাকা

নীল আকাশের ওগো বলাকা,
নিবাস তোমার জানি জলাকা,
নহ মোটা নহ সরু
পার হয়ে যাও মরু
যেন জ্যামুক্ত কোনো শলাকা।

পেলে

ব্রাজিলের কোণ থেকে
দুনিয়া তোমায় খুঁজে পেলে,
ফুটবল সম্রাট
হীরের টুকরো তুমি পেলে।
গোল দাও পটাপট
কেমনে এমন অবহেলে ?

নিতাই-এর দেখাদেখি ক্লাসের আরও বেশ কজন ছেলে ইংরিজি wall magazine-এর দিকে চলে গেছল। দেওয়াল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ক্লাসে তিনটে দল গড়ে উঠল। বাংলা, ইংরিজি আর নিরপেক্ষ। নিতাই আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিল কিন্তু, পত্রিকার মারপ্যাঁচে কদিনেই একটা বিশাল দূরত্ব গজিয়ে উঠল।

দেওয়াল পত্রিকাটা নানা রঙে সুন্দর করে সাজানোর পর একটা কথা বোঝা গেল যে নিতাই নেহাৎ বাজে কথা বলেনি। লেখা, আঁকাগুলোকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে একটা লতানে ফুলগাছ সত্যিই দরকার, না হলে বড্ড নেড়া নেড়া দেখায়। আমাদের আর্ট ডিরেক্টর নিমে বাঁদিক ঘেঁষে তলা থেকে ওপর অবধি লতানে ফুলগাছ বসিয়ে দিল। 'দিগন্ত' লেখাটার দু পাশে দুটো আলপনা দেওয়া শাঁখ নিমে আগেই বসিয়ে রেখেছিল।

'দিগন্ত'র শুভ উদ্বোধন পয়লা আষাঢ়। দারোয়ান শিউচরণদের ঘরের সামনে টিনের চালওলা দাওয়া। সেখানে পাশাপাশি দুটো জাল লাগানো কাঠের ফ্রেম ঝুলছে। একেকটাতে দুটো করে জোরালো আলোর ব্যবস্থা। কানাঘুষোয় শুনলাম যে ইংরিজি পত্রিকাও ওই দিনই বেরোবে।

জগন্নাথ বলল, 'রেষারেষির বহরটা দেখেছিস!! কদিন আগে বা পরে বার করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় যেত ?'

পয়লা আষাঢ় বুধবার সকালে দুটো পত্রিকারই শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। পাশাপাশি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, 'দিগন্ত' আর 'রেনেস্যাঁস'।

আমরা উঁকি মেরে দেখলাম 'দিগন্ত'র সঙ্গে তুলনা না হলেও 'রেনেস্যাঁস'টা নেহাত খারাপ হয়নি।

জগা বলল, 'আইটেমগুলো আমাদের দেখে টুকলি করেছে রে! গল্প, কবিতা, ছবি, শব্দজব্দ, জ্ঞানবিজ্ঞান!'

কথা শেষ হবার আগে ওদিক থেকে ভারি গলায় জবাব এল, 'টুকলি করতে বয়ে গেছে।' তাকিয়ে দেখি নিতাই।

পত্রিকাটায় অনেকগুলো ছবি ছিল। তার ভেতর একটা বেশ বড় সাইজের মহিলার ছবি। তলায় লেখা,'মোনালিসা',তার তলায় নিতাই-এর সই। ছবিটা খুব চেনা লাগলো। কোথায় যেন দেখেছি। যে যাই বলুক, মন্দ আঁকেনি কিন্তু নিতাই!

স্যারেরা অনেকে দেওয়াল পত্রিকা দুটোরই প্রচুর তারিফ করলেন। টিফিনের সময় লেগে গেল ছেলেদের ভিড়। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কিছু ছেলে পড়ছে আর বাকিরা পড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ওদের ঘাড়ে। আমাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ইংরিজি পত্রিকার কর্মসচিবেরাও একই দৃশ্য উপভোগ করছে। সন্ধ্যে হতেই জোরালো আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। মেন গেটের বাইরে, রাস্তা থেকে আলো দেখে দু-চারজন বাইরের লোকও ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল দেওয়াল পত্রিকার সামনে।

আমি নয়নকে বললাম, 'যাই বলিস, আমাদেরটাতে কিন্তু ভিড় অনেক বেশি।'

নয়ন মুগ্ধ গলায় উত্তর দিল, 'তা আর বলতে!'

দেওয়াল পত্রিকার উত্তেজনাটা কদিনেই অনেক কমে এল। পরের সংখ্যার প্রস্তুতি ঢিমেতালে চলল। পরের সংখ্যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আর রসদ সংগ্রহ শুরু হলো।

সেদিন আমি আর দুলাল ছাতা মাথায় হন্তদন্ত হয়ে ইস্কুলে ঢুকছি, আমাদের দেখেই ক্লাস এইটের চন্দ্রনাথ দৌড়ে এল, 'দুলালদা, তোমাদের শকুন্তলার টিকি গজিয়েছে! দেখেছ ?' বলেই ও ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল!

আমি বললাম, 'বাজে ইয়ার্কি না মেরে ক্লাসে যা। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'ইয়ার্কি নয়। বিশ্বাস না হয় দেখে এসো।'

আমি আর দুলাল হন্তদন্ত হয়ে দেখতে গেলাম। মিথ্যে বলেনি চন্দ্রনাথ! সত্যিই, শকুন্তলার খোঁপা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে একটা টিকির মতন তৈরি করেছে! আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম টিনের চালের ফুটোটা বার করার জন্য। কিন্তু না! টিনের চালে ফুটো নেই। জল ওখান থেকে পড়েনি। খবর পেয়ে 'দিগন্ত'র সম্পাদকমন্ডলীর সকলেই আগে পরে হাজির হলো। দেখেশুনে সকলেই একমত, জল টিনের চাল দিয়ে পড়েনি। আমাদের কেউ কেউ তো রেগেমেগে বলেই বসল, 'ওদের পত্রিকা কেউ পড়ছে না বলে আমাদেরটা নষ্ট করার মতলব।'

স্বপন বলল, 'ওইজন্যই তখন বলেছিলাম, জালের বদলে কাচ লাগাতে।'

জগা খিঁচিয়ে উঠল, 'বোকা হাতির মতন কথা বলিস না। লাইটের গরমে কাচ একদিনে ফেটে যেত।'

নয়ন আর নিমে আস্তিন গোটাতে শুরু করলো, 'দাঁড়া দেখাচ্ছি, আর বাড়াবাড়ি করলে ওদের পত্রিকা ভিজিয়ে ইয়ে করে দেব।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, পান্তাভাত না গোবর ?'

নয়ন বলল, 'ওসব না, আরো বেশি ভিজলে যেটা হয়, মনে পড়ছে না। কিন্তু তাই বানিয়ে ছাড়বো।'

নিজেদের মনে গজরাতে গজরাতে যে যার ক্লাসে চলে গেলাম। ইস্কুলের পরে আবার সকলে জমায়েত হয়ে অনেক

জল্পনা-কল্পনা হলো। কেউ কেউ বলল, 'শঠে শাঠ্যং, অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে ওদের পত্রিকাও ভিজিয়ে দেব।' কিন্তু বেশির ভাগই এতে আপত্তি জানালো। সম্পাদক জগা বলল, 'আরো ভাবতে হবে।'

পরের দিন টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই বাইরে এসে দেখি ক্লাস টেনের ছেলেরা, মানে 'রেনেসাঁসের' হর্তাকর্তারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের চোখমুখ দেখে মনে হলো ব্যাপার খুব সুবিধের নয়, কিছু একটা ঘটেছে। মদনদা এগিয়ে এল, 'আমাদের ম্যাগাজিনে কে জল ছিটিয়েছে, তোরা জানিস?'

জগা গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমাদের ম্যাগাজিনের জলের খবর তো তোমরাই রাখবে!'

আমাদের ক্লাসের যারা 'রেনেসাঁসের' হয়ে খেটেছিল, তারা মুহূর্তে ওদের পক্ষ নিল। ক্লাস টেনের একজন, জিবেগজার মতন দেখতে, বলল, 'কাজটা তোরা ভাল করলি না। আমরাও রাস্তা জানি।'

আস্তে আস্তে উত্তেজনা বাড়ছিল। আমরা যত বলছি জলটল আমরা দিইনি, ওরা তত শাসাচ্ছে, দেখে নেব, হ্যান করবো, ত্যান করবো বলে। নয়নটার মাথা গরম। হঠাৎ বলে বসল, 'বলছি তো জল দিইনি। তাও যদি বিশ্বাস না হয় তো দিয়েছি বেশ করেছি। কালকে আমাদের শকুন্তলার গায়ে জল দিয়ে টিকি করার সময় মনে ছিল না? জল কারা দিয়েছে আমরা বেশ ভাল করেই জানি।'

মদনদা আর রাগ সামলাতে পারল না। 'তবে রে', বলে নয়নের কলার চেপে ধরে একটা ঘুষি চালালো। নয়ন সহজেই পাশ কাটিয়ে নিল।

মুহূর্তে দুদলে ঝটাপটি লেগে গেল। কিল, চড়, ল্যাং, ঘুষি যে যাকে পারলো লাগাতে থাকলো। তর্কাতর্কি করতে করতে অনেকক্ষণ আগেই আমরা ক্লাসরুমের সামনে ছেড়ে মাঠের ধারে চলে এসেছিলাম। ধস্তাধস্তিতে বেশির ভাগই কাদায় সাঁতরাতে লাগলো।

খবর পেয়ে স্যারেরা অনেকে, মায় হেডস্যার অবধি দৌড়ে না এলে, কাদায় গড়াগড়ি কতোদূর গড়াতো কে জানে! স্যারেদের দেখেই সকলে সটান দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে যে 'রেনেসাঁস' আর কে যে 'দিগন্ত' ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না।

হেডস্যার পত্রিকা নির্বিচারে সকলকেই যাচ্ছেতাই করে বকুনি দিলেন। বললেন, 'ধাড়ি ছেলেদের এই বিশ্রী অসভ্যতা দেখে ছোটগুলো আর ভালো কি শিখবে? আগে জানলে আমি কক্ষণো মত দিতাম না। কে কি করেছে আমি কিচ্ছু জানতে চাই না। যাও এক্ষুণি গিয়ে দেওয়াল পত্রিকাগুলো খুলে ফেল।'

হেডস্যারের কথা বেদবাক্য। আমাদের মাথা হেঁট। সুড়সুড় করে চলে গেলাম সাধের দেওয়াল পত্রিকা বিসর্জন দিতে।

এত দুঃখের ভেতরও ওদের দেওয়াল পত্রিকার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেয়ে গেল। মোনালিসা একেবারে আনমনা হয়ে গেছে। জলের ঝাপটায় মাথাটা ধেবড়ে ঝোলের মতন গলে পড়েছে, আমাদের শকুন্তলার বিকৃতি এর তুলনায় কিছুই না। ওদের রাগকে দোষ দেওয়া যায় না!

ক্লাসরুমের সামনে চওড়া চাতাল, তারপর সিঁড়ির তিনটে ধাপ, তারপর মাঠ আরম্ভ। স্কুলের পর আমরা দিগন্তের কজন বিধ্বস্ত মন আর শরীর নিয়ে সিঁড়িতে বসেছিলাম। কথা বিশেষ বলছিলাম না, কারণ বলার তেমন কিছুই নেই। বৃষ্টি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। উন্মুক্ত নীল আকাশ।

দারোয়ান শিউচরণ তার এক বছরের মেয়ে মুন্নিকে কোলে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কি হলো, অতো সোন্দর জিনিস দুটো তোমরা খুলে লিলে?'

জগা বলল, 'যেতে দাও শিউচরণ, যা হবার তা হয়ে গেছে।'

হরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বাংলা পড়ো?'

শিউচরণ একটু গর্বের হাসি হাসল, 'কুছু কুছু।'

আমি হরিকে বললম, 'দেখেছিস, পত্রিকাটা উঠে যেতে শিউচরণের পর্যন্ত খারাপ লেগেছে।'

শিউচরণ বলল, 'মুন্নির মা দুখিয়ার অওর জ্যাদা খারাব লাগল।'

জগা বলল, 'তোমরা সকলেই বাংলা পড়ো তা কিন্তু আমরা আগে জানতাম না।'

শিউচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, 'মুন্নির ভিজে কাঁথা ম্যাগাজিনকে বিজলি বাত্তিমে কিতনা জলদি শুখিয়ে যাচ্ছিল! ভগবান জানে, আজ, ইতনা বারিষমে দুখিয়া ওসব কাঁহা শুখোবে!!'

ছবিঃ অরুন্ধতী মুখার্জী

ছোট বড় সবার জন্য/ছোট বড় সবার জন্য

হাসি মজা অ্যাডভেঞ্চার ডিটেকটিভ
ডাকাত ভূত এবং অভিযানের আশ্চর্য সব বই

হা রে রে রে/মহাশ্বেতা দেবী
অভিশপ্ত চুনার/প্রলয় সেন
আবিষ্কারের গল্প/শচীন দাশ
রক্তমাখা গুপ্তধন/সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
কাবুল আর টাবুল/প্রফুল্ল রায়
রক্তপ্রবাল/সঙ্কর্ষণ রায়
কালনাগিনীর আক্রোশ/সঙ্কর্ষণ রায়
পাতালপুরীর অভিযান/শিশিরকুমার মজুমদার
চার পলাতকের কাহিনী/কবিতা সিংহ

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বাঘবন্দী

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমাদের পড়াতেন জুড়ানবাবু। তাঁর তখন অনেক বয়স। প্রায় সত্তর বছর। বাঁ কাঁধের ওপর পাট-করা চাদরটি ফেলে আমাদের পড়াতে আসতেন, শীত গ্রীষ্ম বারো মাস। শরীর ভেঙে এসেছিল। নানা রোগ বাসা বেঁধেছিল ভাঙা শরীরে। কিন্তু সেই শীর্ণ মুখে দেখবার মতো ছিল তাঁর পাকা গোঁফ জোড়া আর ঝকঝকে উজ্জ্বল দুটো চোখ। সে চোখের দিকে যখনই তাকিয়েছি মনে হয়েছে তার অতলে কোথায় যেন অফুরন্ত তেজ আর শক্তি লুকিয়ে আছে।

আমার ছোট ভাই বাঞ্ছাকে আর আমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। প্রায়ই তাঁর জীবনের নানা ঘটনার কথা শোনাতেন। একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে যৌবনের জুড়ানবাবুকে দেখেছিলাম একটা ফটোতে। ফটোর জুড়ানবাবুর সঙ্গে আমাদের মাস্টারমশাই জুড়ানবাবুর খুব কমই মিল ছিল। ফ্রেমে আঁটা জুড়ানবাবুর বিশাল বুকের ছাতি দেখেই বুঝেছিলাম জবরদস্ত জোয়ান ছিলেন এককালে।

তাঁরই মুখে শোনা এক বাঘ শিকারের ঘটনা আজও মনে আছে।

সেটা ১৯৩৯ সাল। কলকাতার কাগজগুলোতে ফলাও করে ছাপা হলো সুন্দরবনের এক মানুষখেকোর কথা। সুরেন্দ্রগঞ্জ-মহেন্দ্রপুর অঞ্চলের মানুষের কাছে বাঘটা তখন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চব্বিশ পরগণার প্রায় গোটা দক্ষিণ দিকটা জুড়ে সুন্দরবনের জঙ্গল। রায়মঙ্গল, মাতলা, গোসাবা, হাড়িয়াভাঙা প্রভৃতি নদীর মোহনার মুখে মুখে জেগে ওঠা ছোট ছোট দ্বীপগুলোও জঙ্গলে ভরা। 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ' কথাটা এখানকার সম্বন্ধে যেমন খাটে তেমন বোধহয় আর কোনোখানেই খাটে না। এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে জনবসতি কিন্তু কিছু কম নয় আর যারা এখানে থাকে তাদের ভরসাও ঐ জঙ্গল। তারা জঙ্গলের কাঠ কেটে, মৌচাকের মধু ও মোম সংগ্রহ করে, মৃত পশুর চামড়া বিক্রি করে ও নদী থেকে মাছ ধরে নিজেদের পেট চালায়। তাই জলে স্থলে হিংস্র পশুদের অত্যাচার তাদের সহ্য করতেই হয়। তবে সেই অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়ায় তখন তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। যেমন সেবার সেই মানুষখেকোটাকে মারবার জন্য মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার।

আমাদের জুড়ানবাবু এককালে নামী শিকারী ছিলেন। সরকারী ঘোষণার কথা জানতে পেরে তিনি ঠিক করলেন সুন্দরবন যাবেন বাঘ মারতে। তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়ি ছিল মেটেবুরুজে। সেখান থেকেই তিনি একদিন ভাড়া নৌকোয় চড়ে বসলেন। সঙ্গে নিলেন তাঁর ৫০০ বোরের রাইফেল, হান্টিং বুট আর অন্যান্য দরকারী জিনিস।

দিন তিনেক বাদে কাকদ্বীপ পৌঁছলেন জুড়ানবাবু। তখন কাকদ্বীপে একটা খেয়াঘাট পর্যন্ত ছিল না। হান্টিং বুটজোড়া একহাতে, রাইফেলটা অন্য হাতে নিয়ে প্রায় কোমরজল ভেঙে তিনি তীরে উঠলেন। তখন রাত হয়ে এসেছে। ওখানকারই এক গৃহস্থ বাড়িতে তাঁর সেদিনের মতো আশ্রয় মিলে গেল। খবর পাওয়া গেল ওই গ্রামের দু'তিন গ্রাম পরেই রায়না গ্রামের

মোড়ল শেখ বসিরুদ্দিনের মেয়েকে নাকি বাঘে ধরেছে।

মানুষের বুদ্ধির সংগে টক্কর দিতে দিতে মানুষখেকো বাঘেরা ভীষণ সেয়ানা হয়ে ওঠে। জুড়ানবাবু তা জানতেন। তাই মোড়লের মেয়েকে বাঘে ধরেছে এ কথা জেনে তাঁর স্বস্তি ছিল না। ভোর হতে না হতেই গৃহস্থের বাড়িতে কলার বড়া দিয়ে খানিক পান্তা খেয়ে নিয়ে ছুটলেন রায়না গ্রামে।

শেখ বসিরুদ্দিনের একমাত্র মেয়ে আয়েষা। বড় ভালবাসত বসির এই মেয়েটাকে। ছটফটে প্রজাপতির মতো সুন্দর আয়েষাকে সে অঞ্চলের সবাই স্নেহ করত। বয়স ছিল বছর বারো।

মার বারণ না শুনে আয়েষা ক্ষেতে গিয়েছিল কড়াইশুঁটি তুলতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল অথচ আয়েষা ফিরল না দেখে ওকে খুঁজতে দলবল বেরোল আয়েষাকে পাওয়া গেল ক্ষেত থেকে মাইল তিন উত্তরে এক মজে যাওয়া নালার পাশে। বাঘের থাবার আঘাতে একটা হাত কাঁধ থেকে ছিঁড়ে নেমে এসেছিল। পেটের সামান্য মাংস খাওয়া

অভিজ্ঞ শিকারী জুড়ানবাবু পরীক্ষা করে বুঝলেন বাঘ আবার মৃতদেহের মাংস খেতে ফিরে আসবে কারণ মৃতদেহটা একটা বড় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ছিল বাঘের এই মড়ি বা মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা স্বভাবের কথা জুড়ানবাবুর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি জানতেন বাঘ যখন আবার ফিরে এসে মড়িতে বসবে তখন সে ওটাকে ওখান থেকে কিছুদূরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। ফলে হয়তো তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে বাঘটা। ভেবেচিন্তে জুড়ানবাবু মৃতদেহটাকে ঝোপের বাইরে সামান্য টেনে আনলেন। পকেট থেকে বার করলেন বেশ খানিকটা সরু তার, তারপর সেই তার মৃতদেহের কোমরে বেঁধে তারের মুখ দুটি দুপাশে একটা বাবলা আর একটা ঘোড়ানিম গাছের গুঁড়ির সংগে বেঁধে দিলেন। বাঘের আর মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাবার উপায় রইল না। মৃতদেহের পিছনে একটা মজে যাওয়া নালা ছিল। সেই নালার কাদামাটিতে বাঘের পায়ের ছাপও মিলল। বাঘটা ছিল পূর্ণবয়স্ক।

শিকারীরা গাছের উপর মাচানে বসে শিকার করে আবার মাটির উপর বসেও করে । বাঘটাকে মারবার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে জুড়ানবাবু ঠিক করলেন মাটির উপরই বসবেন। দুজন গ্রামবাসী মৃতদেহ থেকে ৬০ গজ দূরে মাটিতে একজন মানুষ বসতে পারে এমন একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল। তারপর শুকনো ডালপালা দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিল।

আয়েষা ছিল তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু গ্রামের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে শেখ বসিরুদ্দিন সেদিন যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তার তুলনা পাওয়া ভার। শেখ বলেছিলেন, তিনি আয়েষার মৃতদেহ কবর দেবেন না। দুশমনটাকে মারা হলে তবে সে কাজ হবে।

সেদিন এক গ্রামবাসীর ঘরে জুড়ানবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে পেটভরে ভাত খেলেন তিনি। আর তাতেই এক মস্ত ভুল করে ফেললেন। শিকারে যাবার আগে সবসময় হাল্কা খাওয়া খেতে হয়। কিন্তু গ্রামবাসীটির জেদাজেদিতে তাঁর খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল। যাই হোক, খাওয়া সেরে জুড়ানবাবু রওনা দিলেন মড়ির দিকে।

দিনটি ছিল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া। একটু দেরিতে হলেও চাঁদ যখন উঠল তখন তার আলোয় মৃতদেহটার ওপর নজর রাখতে কোনো অসুবিধা হলো না জুড়ানবাবুর। গর্তে বসে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন সেদিনই বাঘটাকে তিনি মারতে পারেন। নিঃশব্দে বসে থাকতে থাকতে জুড়ানবাবু ভাবতে লাগলেন তাঁর বাড়ির কথা, কলকাতার স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে ওই অবস্থায় দেখতে পেলে কি করত ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছেন তিনি তা ঠাহরই পাননি। হঠাৎ তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁকে ঠেলছে ! ঘুমের আমেজ ফিকে হতে স্পষ্ট শুনলেন কচি গলার ডাক, 'চাচা মারেন, চাচা মারেন।'

চমকে উঠে আশেপাশে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলেন না তিনি। হঠাৎ একটা চপ্ চপ্ আওয়াজ হতেই ৬০ গজ দূরে মড়ির দিকে চোখ পড়ল ওঁর। তিনি সংগে সংগে রাইফেল তুলে নিলেন। হয়তো বা পাতার মৃদু খস্‌খস্ আওয়াজ হয়েছিল এবং সেই সামান্য শব্দেই বাঘ খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল। সংগে সংগে বাঘের দুচোখের ঠিক মাঝখানটা তাগ করে গুলি চালিয়ে দিলেন জুড়ানবাবু।

প্রচন্ড শব্দে বনান্তর কেঁপে উঠল। বিকট তীব্র গর্জন করে বাঘটা মাটি থেকে হাত দশেক লাফিয়ে উঠল। জুড়ানবাবুও গর্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন। নির্ভুল লক্ষ্যে আবার গুলি চালালেন। বাঘটা ঘুরে পড়ে গেল আর উঠল না।

গ্রামের সকলে শব্দ শুনে আলো লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোতে বাঘটাকে মড়ির কাছেই পাওয়া গেল। সবার আগে ছুটে এলেন বসিরুদ্দিন। খোলা দা-এর এক কোপ বসিয়ে দিলেন মৃত বাঘের গলায়। বসিরুদ্দিনের বউ জুড়ানবাবুর পা ধরে কেঁদে উঠল, 'আপনিই আয়েষারে শান্তি দিলেন।'

কথাটা শুনে জুড়ানবাবুর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। যদি তিনি ঘুমিয়েই থাকতেন তাহলে তো ওই মানুষখেকোটা মারা পড়ত না। কে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সে গলা তো এক কচি মেয়ের ! নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জুড়ানবাবু। একবুক ভালবাসা, মমতা, শিহরন, ভয় ওঁর মনের মধ্যে সাড়া তুলল, যার সবকিছুই একটা চঞ্চল ছোট্ট মেয়েকে ঘিরে। তাকে জীবিত দেখেননি উনি কিন্তু শুনেছেন কি ওর ডাক ?

ছবি : দিলীপ দাস

গোয়েন্দা কাহিনী

অর্কর গোয়েন্দাগিরি

মঞ্জিল সেন

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে খেলে ফেরার পথে অর্ক আর বালচন্দ্রনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল, এড্‌গার অ্যালান পো'র দ্যুপে বড় গোয়েন্দা, না কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস। ডিটেকটিভ বই দু'জনেরই বিস্তর পড়া, কেউই পিছু হঠতে রাজী নয়। হঠাৎ তর্কের মাঝখানে অর্ক থেমে গেল, ওর কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা রেখা। দু'জন লোক পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, খুব যেন তাড়া আছে এমন ভাবে হাঁটছে। একজনের কোলে বছর তিনেকের একটি ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটির হাতে একটা ফাইভ স্টার ক্যাড্‌বেরি, সেটা সে পরম আনন্দে চুষছে।

পার্কে খেলতে আসবার সময় অর্ক ওই মেয়েটিকে কয়েকবারই দেখেছে। পার্কের কাছেই একটা মস্ত বড় বাড়ি থেকে মেয়েটি তার বারো তেরো বছরের দাদা আর দশ এগারো বছরের দিদির সঙ্গে পার্কে আসে। একদিন শিশু-উদ্যানেও ওদের দেখেছে অর্ক, বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ওর দিদি দোলনায় বসেছিল, আর দাদা দোল দিচ্ছিল। ওরা যে বাচ্চাটির দাদা দিদি তা চেহারা থেকেই বোঝা যায়। তিনজনেই খুব ফর্সা আর সুন্দর দেখতে। কিছুদিন হলো ওদের বাড়িটায় রঙ করা হয়েছে। দোতলার বারান্দা অর্কিড আর গোলাপের টব দিয়ে সাজানো।

লোক দুটি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কেমন যেন সন্দেহজনক আচরণ। ওদের আগে কখনও দেখেনি অর্ক। বাচ্চার দাদা দিদিই বা সঙ্গে নেই কেন? লোক দুটি রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেল, একটা চলন্ত ট্যাক্সির দিকে হাত তুলে থামতে বলল। ট্যাক্সিটা কিন্তু থামল না। লোক দুটো যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সির জন্য ছুটোছুটি করছে। তখুনি অর্কর মাথায় জেগে উঠল একটা ভয়ানক সম্ভাবনা। ওরা কি মেয়েটিকে নিয়ে পালাচ্ছে! শিশু-উদ্যানে ভিড়ের মধ্যে ওর দাদা দিদি যখন অন্যমনস্ক তখন মেয়েটিকে সরিয়ে ফেলেছে! যাতে না কাঁদে তাই ক্যাড্‌বেরি ধরিয়ে দিয়েছে হাতে!

অর্ক হঠাৎ চুপ করে যাওয়াতে বালচন্দ্রন একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে লোক দুটিকে দেখে বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে।

'হোয়াটস দ্য প্রবলেম?' ও জিগ্যেস করল।

'লোক দুটো নিশ্চয়ই ওই বাচ্চাটাকে কিড্‌ন্যাপ করছে,' অর্ক বলল।

লোক দুটি ততক্ষণে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ভেতরে উঠে বসেছে। ট্যাক্সি রাসবিহারী মোড়ের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য থেমে গেছে। অর্ক বালচন্দ্রনের একটা হাত ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কাম্ অন্।'

একটা খালি ট্যাক্সি ওদের সামনেই থেমেছিল, সামনে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য পর পর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে নিচু গলায় অর্ক বলল, 'ওই ট্যাক্সিতে দু'জন লোক একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা ওদের ফলো করতে চাই। যাবেন?'

'বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!' ট্যাক্সি ড্রাইভারের দু'চোখে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া খেলে গেল। 'কি করে বুঝলে?'

'আমি মেয়েটিকে চিনি,' অর্ক জরুরী গলায় বলল, 'ওর দাদা আর দিদির সঙ্গে পার্কে বেড়াতে আসে। ওই লোক দুটিকে

আগে কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে দাদা দিদির চোখ এড়িয়ে ওরা ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

ততক্ষণে সিগন্যাল পেয়ে সব গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

'উঠে পড়' ড্রাইভার বলল। একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা তাকেও যেন পেয়ে বসেছে।

'আপনি ভাড়ার জন্য ভাববেন না,' গাড়িতে উঠতে উঠতে অর্ক বলল, 'আমরা এই ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরব, তখন ভাড়া দিয়ে দেব। আর ওদের যদি ধরতে পারি তবে তো কথাই নেই–'

'ঠিক আছে,' ড্রাইভার বলল, 'ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না... আমি ট্যাক্সিটার পিছু নিচ্ছি, তোমরাও নজর রাখ, যাতে ভিড়ের মধ্যে চোখের আড়াল না হয়ে যায়।'

'ওরা জানে না যে আমরা ওদের ফলো করেছি,' অর্ক বলল, 'সেই সুবিধেটুকু আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।'

আগের ট্যাক্সিটা চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল। দুর্গাপুর ব্রিজ হয়ে, নিউ আলিপুরের ভেতর দিয়ে, ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে পড়ল বেহালায়। ট্রাম ডিপোকে বাঁ পাশে রেখে ট্যাক্সিটা চলেছে ব্রাহ্মসমাজ রোড ধরে।

ওরা লক্ষ্য করছিল সামনের ট্যাক্সির আরোহী দু'জন মাঝে মাঝেই পেছনের কাচ দিয়ে দেখছিল। অর্কদের ট্যাক্সির ড্রাইভারও সেটা লক্ষ্য করেছিল, তাই সে যতদূর সম্ভব দু'একটা গাড়ির পেছনে নিজের গাড়িকে রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একবার কিছুক্ষণের জন্য আগের ট্যাক্সির পেছনে আর কোনো গাড়ি না থাকায় ওদেরটা একা হয়ে পড়ল। একটা দারুণ উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল অর্কদের। দুষ্টু লোক দু'জন কি বুঝতে পেরেছে যে ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে!

হঠাৎ সামনের ট্যাক্সিটা ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকল। অর্কদের ড্রাইভারও পিছু নিল। এবার আর ফাঁকি দেবার উপায় নেই, লোক দুটো পেছন ফিরে ওদের গাড়িটা লক্ষ্য করে কি যেন বলাবলি করল, অন্তত তাই মনে হলো অর্কদের। ওদের ড্রাইভার গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়ল, বেশি কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল। ওদের কাছে বোমাটোমাও থাকতে পারে। খানিকটা গিয়ে সামনের গাড়িটা বাঁ দিক ঘেঁষে থামল।

'আপনি গাড়ি থামাবেন না,' অর্ক ড্রাইভারকে বলল, 'মনে হয় ওরা সন্দেহ করেছে। আমরা এগিয়ে সুবিধেমতো একটা জায়গায় থামব যাতে ওদের ওপর নজর রাখতে পারি।'

'ঠিক আছে,' ড্রাইভার জবাব দিল।

ওরা যখন ওই ট্যাক্সিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, অর্ক আর বালচন্দ্রন আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একজন পেছনের সীটের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের গাড়ির ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে, আরেকজন বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে আছে। বাচ্চাটার কান্নার শব্দ ওদের কানে এল।

খানিকটা এগিয়েই রাস্তাটা আবার ডান দিকে মোড় নিয়েছে। অর্কর নির্দেশমতো গাড়িটা সেই গলিতে ঢুকল। তারপর একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে অর্ক ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা দু'জন গিয়ে দেখি ওরা কোন দিকে যায়।'

'উঁহু, তোমরা ছেলেমানুষ,' ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে ড্রাইভার বলল, 'চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।'

ওরা হেঁটে ফিরে চলল। যেখানে আগের ট্যাক্সিটা থেমেছিল, এখন সেখানে ওটা নেই, সেই লোক দু'জনকেও চোখে পড়ল না। ওরা খুব হতাশ হয়ে পড়ল। এদিক ওদিক তাকিয়েও দুষ্টু লোকদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। ট্যাক্সি যেখানে থেমেছিল তার বাঁ দিকে একটা সরু গলি দক্ষিণ বরাবর চলে গেছে। লোক দুটো নিশ্চয়ই ওই পথে পালিয়েছে।

ওই গলির মুখ একটু ছাড়িয়ে উল্টোদিকে একটা বাড়ির রকে সাত আটজন তরুণ আড্ডা দিচ্ছিল। পনেরো থেকে সতেরো আঠারো সব বয়সের ছেলেই আছে সেই দলে। অর্ক তাদের দিকে এগিয়ে গেল, একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদা, একটু আগে এখানে একটা ট্যাক্সি থেমেছিল, আপনারা কেউ দেখেছিলেন?'

'কেন, তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' একজন রুক্ষ গলায় পালটা প্রশ্ন করল।

'কি মতলব তোমার?' আরেকজন বলল, 'কি নাম তোমার, থাক কোথায়?'

'আমার নাম অর্ক চৌধুরী, আমি থাকি বালিগঞ্জের দিকে,' অর্ক একটু থতমত খেয়ে জবাব দিল।

'বালিগঞ্জ! তা কি মতলবে এসেছ চাঁদু,' আরেকজন বলল, 'কোথায় পা ফেলেছ জান?'

আসলে ওরা এ পাড়ার মাতব্বর, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করবার সুযোগ ছাড়বে কেন!

'যে ট্যাক্সিটার কথা আমি বলছি,' অর্ক এবার গুছিয়ে বলল, 'সেটায় দু'জন গুন্ডা এক বাচ্চা মেয়েকে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে চুরি করে এনেছে। আমরা ট্যাক্সিটাকে ফলো করে এসেছি...ওরা বুঝতে পেরেছিল তাই আমরা আমাদের ট্যাক্সি এখানে থামাইনি, ওই মোড়ের কাছে গিয়ে থামিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সেই ট্যাক্সিটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'অর্ক!' হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন কিশোর বলে উঠল, 'মানে, গোয়েন্দা অর্ক! কাগজে যার কাহিনী ছাপা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ', একটু লাজুক মুখে জবাব দিল অর্ক।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য গেল বদলে। তরুণের দল অর্ককে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একজন বলল, 'হ্যাঁ, একটা ট্যাক্সিকে থামতে দেখেছি। দু'জন লোক গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকেছিল। ভাড়া নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে একটু যেন কথা কাটাকাটি হয়েছিল, বাচ্চাটা কাঁদছিল। তারপর ট্যাক্সিটা চলে গিয়েছিল। ওটার নম্বরটা খেয়াল করিনি।'

'ডব্লু.বি.টি. ৮৭০৫,' অর্ক বলল।

ইতিমধ্যে বালচন্দ্রন আর ওদের ট্যাক্সির ড্রাইভার ওখানে এসে গেছে, অর্ক ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

ছেলেরাই ওদের নিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, যার সঙ্গেই দেখা হলো তাকেই জিগ্যেস করল এক বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে দু'জন লোককে যেতে দেখেছে কিনা। গলিটায় আলো তেমন নেই, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, লোক চলাচল তেমন ছিল না; বিশেষ সুবিধে হলো না। তবে গলিটা ওধারে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকানের মালিক বলল দু'জন লোককে একটা বাচ্চা নিয়ে যেতে দেখেছে। তারা হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিল। বাচ্চাটা একটা লালিপপ্ চুষছিল। দোকানের মালিক আর লক্ষ্য করেনি।

গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়ল

অনেক চেষ্টা করেও লোক দুটির সম্বন্ধে আর কিছু জানা গেল না, কোনদিকে গেছে তাও না।

তরুণ দলের কাছে বাচ্চার এবং লোক দু'জনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে আর খোঁজখবর করতে অনুরোধ করে অর্ক আর বালচন্দ্রন ফিরে চলল। একটা হতাশায় অর্কর মন ভরে গেছে। চোখের সামনে থেকেই গুণ্ডারা মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল!

বালচন্দ্রন ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'ডোণ্ট ওরি, উই শ্যাল ক্যাচ দেম।'

এদিকে আটটা বেজে গেছে, বাড়িতে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। ওরা প্রথমে বাড়ি গেল। দু'জনের বাড়িতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গিয়েছিল, আরেকটু দেরি হলেই থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতেন অর্ক আর বালচন্দ্রনের বাবা। অর্ক বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল। সে বলল, 'আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারলাম না, ভাড়া নিতে খারাপ লাগছে। কিন্তু ট্যাক্সির মালিক আমাকে ছাড়বে না, তাই নিতে হচ্ছে। তবে যদি কখনও ট্যাক্সির দরকার হয়, যে সময়েই হোক, এই ঠিকানায় খোঁজ করবে, যত অসুবিধেই হোক গাড়ি নিয়ে আমি ঠিক হাজির হবো।'

অর্ক ওর বাবাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি তখুনি গাড়ি করে অর্ককে নিয়ে মেয়েটির বাড়ি রওনা হলেন।

বাড়ির সামনে মানুষের জটলা, একটা পুলিশের গাড়িও চোখে পড়ল। অর্ক ওর বাবাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। সামনের ঘরেই একটা সোফায় এক মাঝবয়সী মহিলা মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদছেন, একজন ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে তাঁর পাশে বসে আছেন। তাঁদের পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা মেয়েটির দাদা আর দিদি। রোজকার মতো ছোট বোনকে নিয়ে ওরা পার্কে গিয়েছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, তারপরই দেখে পাশে বোন নেই। অনেক খুঁজেছে কিন্তু বোনকে পায়নি।

টালিগঞ্জ থানার ও.সি. কি সব নোট করছিলেন। অর্ক আর ওর বাবাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি আপনারা!'

অর্ক আর ওর বাবার সঙ্গে ও.সি.-র এতদিনে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে অর্ককে তিনি স্নেহের চোখে দেখেন। এই কিশোর ছেলেটির বুদ্ধি আর সাহস তাঁর মনেও দাগ কেটেছে।

'এ বাড়ির যে বাচ্চা মেয়েটি চুরি হয়েছে,' অর্ক ও.সি.-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে সম্বন্ধে আমি কিছু খবর দিতে চাই।'

'সে কি!' ও.সি. যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'এ ব্যাপারে তুমি কি জান?'

অর্ক তখন গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'সাব্বাশ!' ও.সি. ওর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'তুমি তো আমাদের পরিশ্রমের অনেকটাই বাঁচিয়ে দিলে। এই না হলে গোয়েন্দা অর্ক।'

বেহালা থানার ও.সি.-র সঙ্গে তিনি তখুনি যোগাযোগ করলেন, লোক দুটির চেহারার বর্ণনাও দিলেন। যেখানে ওদের শেষবার দেখা গিয়েছিল তার ধারে কাছে ওদের আস্তানা হতে পারে বলে জানালেন। ট্যাক্সির নম্বরটাও অর্ক জানিয়ে দিল।

মেয়েটির বাবাকে আশ্বাস দিয়ে পুলিশ বিদায় নিল, অর্ক আর ওর বাবাও ফিরে গেলেন।

পরদিনই মেয়েটির বাবা ফোন পেলেন।এক লাখ টাকার বদলে মেয়েটিকে মুক্তি দেওয়া হবে। আর তা না হলে মেয়ের মরা মুখ দেখবেন বাবা। কোথায় কখন টাকা দিতে হবে তা পরে জানানো হবে। পুলিশের শরণাপন্ন হলে মেয়েকে আর ফিরে পাবেন না।

পুলিশ অবশ্য তৎপর হয়ে উঠল। বেহালা থানার ও.সি. ওই জায়গায় চর পাঠিয়ে লোক দু'জনের খোঁজ করতে লাগলেন।

ওদিকে অর্কর মাথায় তখন কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে। বালচন্দ্রনকে নিয়ে ও টালিগঞ্জ থানার ও. সি.-র সঙ্গে দেখা করল। তিনি ওদের দেখে বললেন, 'এসো গোয়েন্দা কোম্পানি, তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। কোনো খবর আছে নাকি? শুনেছ তো মিঃ বোস (বাচ্চা মেয়েটির বাবা) লাখ টাকার পরোয়ানা পেয়েছেন। উনি এক কোম্পানির ডিরেক্টর, পয়সাওলা লোক, এসব খবর চোররা রাখে দেখা যাচ্ছে।'

'আমরা সেই বিষয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,' অর্ক বলল, 'লোকদুটো থাকে বেহালায়। সেখান থেকে এতদূরে বেছে বেছে ওই বাড়ির মেয়েকেই তারা চুরি করল, তাই মনে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে প্ল্যান করে এ কাজ করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে,' ও. সি. সপ্রশংস কণ্ঠে বললেন।

'আমার ধারণা ও বাড়িরই কেউ ওদের খবর যুগিয়েছে।'

'রাইট ইউ আর,' ও. সি. প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'এ সম্ভাবনাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এখন আমাদের দেখতে হবে ও বাড়ির কারও বেহালায় কোনো আত্মীয় বা জানাশোনা কেউ আছে কিনা।'

'আমারও মনে হয় সেদিক দিয়ে খোঁজখবর করলে ওই দুষ্টু লোকদের হদিস পাওয়া যাবে,' অর্ক বলল।

'গুড্ আইডিয়া,' ও. সি. বললেন, 'চল দেখি বোস সাহেবের বাড়ি যাওয়া যাক।'

মিঃ বোস আপিস যাননি, বাড়িতেই ছিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ও. সি.-র বক্তব্য শুনে মিঃ বোস একটু চিন্তা করে বললেন, 'বেহালায় আমাদের কেউ নেই।'

'আপনার বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের কেউ কি বেহালায় থাকে?' ও.সি. জানতে চাইলেন।

'যারা কাজ করে তাদের মধ্যে আছে একজন ওড়িয়া ঠাকুর, সে দু'বেলা রান্না করে চলে যায়, ভবানীপুরে দেশের লোকজনের সঙ্গে থাকে, বেহালায় তার কেউ আছে বলে জানি না। আর আছে কাত্যায়নী। বাংলাদেশের এক উদ্বাস্তু বিধবা, সংসারে তার আর কেউ নেই। আমাদের বাড়ি প্রায় কুড়ি বছর আছে, বেহালায় তার কেউ আছে বলে শুনিনি। তা ছাড়া একজন ঠিকে কাজের মেয়ে আছে। সে একবেলাই আসে, ঘর ঝাড়-মোছ করে। ও, হ্যাঁ, আমার ড্রাইভার রামকিষেণের নাম বলতে ভুলে গেছি। ছাপরা জেলায় বাড়ি, দশ বছরের উপর আমার গাড়ি চালাচ্ছে। এখানেই থাকে। বেহালায় তারও কেউ নেই।'

'আপনার ঠাকুর কত বছর কাজ করছে?'

'তা বছর পাঁচেকের বেশিই হবে, এর আগে ওর কাকা রান্নার কাজ করত, সে-ই ওকে দিয়ে দেশে চলে গেছে।'

'হুঁ। আর ঠিকে কাজ করার মেয়েটি?'

'সে অবিশ্যি অল্পদিন হলো ঢুকেছে, দু' মাসের বেশি হবে না। তবে সে আমাদের পাশের বাড়িতে এক বুড়ি কাজ করে, তার ভাইঝি—ওই বুড়ি অনেকদিন ধরে ও বাড়িতে কাজ করছে। ভাইঝিকে দেশ থেকে আনিয়েছে।'

'তার আগে যে ছিল, সে কি কাজ ছেড়ে দিয়েছে?' ও.সি. একটু ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন।

'না, তা ঠিক নয়,' মিঃ বোস জবাব দিলেন, 'আসলে সেই মেয়েটির হাতটান ছিল, এটা ওটা সরাচ্ছিল। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই ওর কাছে লোকজন দেখা করতে আসত, কাজের সময় এখানে তাদের আসাটা আমার স্ত্রীর পছন্দ ছিল না।'

'আই সী', ও. সি. আপন মনেই বললেন।

'যারা ওর কাছে আসত তাদের চেহারা বলতে পারেন?' অর্ক হঠাৎ প্রশ্ন করল!

মিঃ বোস ওর মুখের দিকে এক পলক তাকালেন, তারপর বললেন, 'একদিন একজনকে আমি যখন তখন বাড়িতে আসার জন্য ধমকেছিলাম। তার গায়ের রঙ ময়লা, গট্টাগোট্টা চেহারা, চুলের সামনেটা সাপের মতো ফণা আর বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি, যাবার সময় কটমট করে তাকাচ্ছিল।'

'আপনি বলছেন সেই লোকটার চুল সাপের হুডের (hood) মতো ছিল,' বালচন্দ্রন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'যে দু'জন আপনার মেয়েকে চুরি করেছে তাদের একজনের মাথার চুল অমন ছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'হ্যাঁ,' অর্ক সায় দিল, 'আমারও মনে পড়ছে, তার বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল।'

'সেই মেয়েটি কোথায় থাকে জানেন?' ও. সি. জিগ্যেস করলেন, 'না, সে খবরও রাখেন না?'

'না,' ম্লান মুখে ঘাড় নাড়লেন মিঃ বোস।

'কি মুস্কিল!' ও.সি. মন্তব্য করলেন, তারপর বললেন, 'আপনাদের কাত্যায়নীকে একবার ডাকুন তো, তার কাছে মেয়েটি ঘরের কথা কিছু বলে-টলে থাকতে পারে।'

কাত্যায়নীর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। শক্ত কাঠির মতো চেহারা, মাথায় কদমছাঁট চুল। বাংলাদেশে সবকিছু হারিয়ে আসার পর এ বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছিল, তাই এ বাড়ির ওপর তার একটা মায়া পড়ে গেছে।

ও.সি.-র প্রশ্নের জবাবে সে বলল সুবালা, মানে সেই কাজের মেয়েটি, টালিগঞ্জ ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ হাতি একটা বস্তিতে থাকে, তাকে বলেছিল। মেয়েটির স্বামী অনেকদিন নিরুদ্দেশ। কয়েক বাড়িতে ঠিকে কাজ করে সে পেট চালায়। বেহালায় ওর স্বামীর এক ভাই আছে, সেই নাকি মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত।

ও. সি. তখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটলেন। বস্তিটা খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগল না। পুলিশের গাড়ি দেখে ভিড় জমে গেল। ও. সি.-র প্রশ্নের জবাবে বস্তিবাসীরা জানাল, সুবালা কয়েক বছর ধরেই ওখানে ছিল, দিন কয়েক হলো ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বলেছে, এক বড়লোকের বাড়িতে খাওয়া-পরার কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে। সাপের ফণার মতো চুলওলা লোকটির নাম বিশে, সে নাকি সুবালার স্বামীর কি রকম ভাই, মাঝে মাঝে সুবালার কাছে আসত। ইদানীং আরেকজনও তার সঙ্গে থাকত, ঢ্যাঙ্গামতো। একবার সুবালার সঙ্গে বস্তির মানুষদের ঝগড়া হওয়ায় বিশে বলেছিল বোমা মেরে বস্তি উড়িয়ে দেবে, আর তার সাথী একটা বড় ছোরা বার করে নাচাচ্ছিল। এটা হলো দিন পনেরো আগের ঘটনা, তার কয়েকদিন পরেই সুবালা ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

ও.সি. ফিরে এলেন। ওদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। তবে লোক দু'জনের এবং সুবালার চেহারার বিস্তারিত বর্ণনা এবং তাদের নাম বেহালার থানাকে জানিয়ে দেওয়া হলো। পুলিশের বেতার ভ্যানে ভ্যানেও খবর চলে গেল।

যে ট্যাক্সিতে বিশেরা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল তার নম্বর ধরে ড্রাইভারের সন্ধান পাওয়া গেল। সে কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারল না। দেশপ্রিয় পার্কের কাছ থেকে ওরা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিল। লোক দু'জনের হাব-ভাব ড্রাইভারের ভাল

বস্তি থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছিল।

লাগেনি, তবে মেয়েটিকে তারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এমন সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি।

এত করেও বেহালা থানা কিন্তু লোক দুটির কিংবা সুবালার সন্ধান পেল না। বেহালা মস্ত জায়গা, কোথায় যে ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে পুলিশ খুঁজেই পেল না। হয় ওরা খুব সাবধান হয়ে গেছে, নয় বেহালা ছেড়ে অন্য কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে। বেহালার আশ-পাশ অঞ্চলকেও ওদের সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হলো।

এদিকে মিঃ বোসের কাছে টাকা ঠিক করে রাখার জন্য চিঠি এসেছে, একটা অ্যাটাচি কেসে টাকাটা ভরে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। সময়, তারিখ এবং কোথায় তা যথাসময় জানতে পারবেন মিঃ বোস। খামের ওপর নিউ আলিপুরের ডাকঘরের ছাপ। বেহালার যে অঞ্চলে অর্করা শেষ ওদের দেখেছিল, তার কাছাকাছি যদি ওদের ঘাঁটি হয়, তবে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার জন্য নিশ্চয়ই ওদের একজনকে নিউ আলিপুর আসতে হয়েছিল। আসলে ঢ্যাংগা লোকটা আর সুবালার মতো চেহারার মানুষ পথেঘাটে এত ঘুরছে যে, কাকে সন্দেহ করবে পুলিশ! তবু বিশের চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কালো, গাট্টাগোট্টা আর চুলের সামনেটা সাপের ফণার মতো।

গরমের ছুটি শুরু হয়েছে, অর্কদের হাতে এখন অখণ্ড অবসর। ও বালচন্দ্রনের সঙ্গে পরামর্শ করল, পুলিশের ভরসায় না থেকে ওরা নিজেরাই বেহালায় লোক দু'জনের সন্ধান করবে।

ওদের শেষ দেখা গিয়েছিল যে চায়ের দোকানের সামনে, সেখানে রাস্তাটা চওড়া নয়, একটা পাড়ার ভেতর দিয়ে গেছে। তবে সেই রাস্তা দিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়। ও জায়গাটা পুলিশ তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়েছে, সুতরাং নতুন করে কিছু জানবার ওদের নেই। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল অর্কর। বালচন্দ্রনকে ও বলল, 'দ্যাখ্, আমার মনে হয় ওরা এখানেই কোথাও আছে। বিশে এদিকেই থাকত, হয়তো কাছাকাছি কোনো বস্তিতে ঘর নিয়ে আছে। ওর পক্ষে বস্তিতেই থাকা সম্ভব। ওরা নিশ্চয়ই প্ল্যান করে মেয়েটিকে চুরি করেছে, সুবালা তার আগেই মেয়েটির ভার নেবার জন্য টালিগঞ্জের বস্তি ছেড়ে এখানে এসেছে। মেয়েটি ওকে চেনে, আগে বাড়িতে দেখেছে, তাই তার পক্ষে ওকে ভুলিয়ে রাখাও খুব কষ্ট নয়। সুতরাং আমরা এখানে কাছাকাছি কোথায় কোথায় বস্তি আছে তা খোঁজ করে সেখানে নজর রাখব।'

'গুড্ আইডিয়া,' বালচন্দ্রন বলল।

প্রথম যে বস্তিটার খোঁজ ওরা পেল সেটা বড় রাস্তার ওপারে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বস্তিটা। ঘরও অনেক। ওরা একটু দূরে একটা গাছের আড়াল থেকে বস্তির ওপর নজর রাখতে লাগল। ওরা এমনভাবে কথা বলছিল যেন দু'বন্ধু আড্ডা মারছে, কিন্তু চোখ বস্তির দিকে। কে আসছে যাচ্ছে তা খেয়াল রাখছে। প্রথম দিনটা বৃথাই গেল। কালো ষণ্ডামার্কা, সামনের চুল সাপের ফণার মতো, কিংবা ঢ্যাংগা লোকটা ওদের নজরে পড়ল না। সুবালাকে ওরা দেখেনি তাই চেহারার বর্ণনা থেকে নাও চিনতে পারে। বস্তি থেকে অনেক মেয়েই আসছে, কাজে যাচ্ছে, তাদের কাউকেই সুবালা মনে হয় না।

সকালে দু'ঘণ্টা আর বিকেলে দু'ঘণ্টা ওরা পাহারা দিল। দ্বিতীয় দিন বিকেলে অর্ক বলল, 'এভাবে হবে না, কাউকে জিগ্যেস করতে হবে।'

একজন বুড়ি বস্তি থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছিল। অর্ক আর বালচন্দ্রন একটু হেঁটে হঠাৎ যেন সেই বুড়ির মুখোমুখি হয়েছে এমন ভান করল, তারপর অর্কই বলল, 'আচ্ছা তুমি এই বস্তিতে থাক?'

'হ্যাঁ, বাছা,' বুড়ি জবাব দিল, 'কেন বল তো?'

'ওখানে সুবালা নামে কোনো মেয়ে থাকে, বাড়ির কাজ-টাজ করে?'

'তা বলতে পারবনি বাছা, কত মেয়েই তো থাকে,' বুড়ি বলল।

'এ মেয়েটি নতুন এসেছে, সঙ্গে এক বাচ্চা মেয়েও আছে।'

'ও, তুমি বিশে সর্দারের বুনের কথা বলছ?' বুড়ি এবার বলল, 'শ্বশুরবাড়িতে ঝগড়া করে ভায়ের কাছে এয়েছে, ওর মেয়েকে সেদিন বিশে নে এল। কালো মায়ের অমন ধলা বাচ্চা দেখিনি বাপু।'

'বিশে সর্দার!' বালচন্দ্রন এবার বলল।

'হ্যাঁগো, আমরা ওকে আড়ালে বলি সর্দার, ওর দাপটে সবাই ডরায়। এই তো এক মাসটাক হলো এয়েছে। তা এসেই জোয়ান ছেলেদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতেছে, আত্তিরে ওদের জ্বালায় ঘুমাতে পারিনে বাপু,' বুড়ি গজগজ করে বলল।

'আগে কোথায় ছিল?'

'তা জানিনে বাপু,' বুড়ি এবার যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে

জবাব দিল, 'তা তোমরা তার খোঁজ করতিছ কেন বাছা?'

'মানে,' অর্ক বলল, 'সুবালা আগে আমাদের বাড়ি কাজ করত, না বলে চলে এসেছে, তাই ওকে আবার কাজের জন্য বলতে এসেছি।'

'অ! তা ও কি আর কাজ করবে? ভায়ের কাছে ভালই আছে। বিশের রোজগার তো কম নয়।'

'কি করে বিশে?' অর্ক জিগ্যেস করল।

'তা আমি জানিনে,' বুড়ি মুখ নেড়ে বলল, 'কি দরকার আমার ওসব কথায়।'

'কোনটা বিশে সর্দারের ঘর?' অর্ক আবার জিগ্যেস করল।

'বস্তির ও মাথায় টিনের চালার ঘর, সামনের দেয়ালে লতুন অঙ্ করেছে গো, নীল অঙ্। চিনতে ভুল হবেনি।'

বুড়ি চলে গেল। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অর্ক বলল, 'বিশের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা নেই। আমি এখানে নজর রাখছি, তুই এবার ওই ছেলেদের ডেকে আন, আর হ্যাঁ, টালিগঞ্জ থানার ও. সি.কে ফোন করে খবরটা দিতে ভুলিস না। বিশে লোক সুবিধের নয়।'

বালচন্দ্রন চলে যাবার পরেই ঢ্যাংগা লোকটাকে দেখতে পেল অর্ক। বড় বড় পা ফেলে সে বস্তির দিকেই আসছিল। একেবারে অর্কর মুখোমুখি। এত আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল যে অর্কর কিছু করার ছিল না। ও শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

ঢ্যাংগা লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর আবার বস্তির দিকে হাঁটা দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অর্ক। ও বস্তির দিকে উল্টো মুখ করে গাছের তলায় বসল, বালচন্দ্রনের কত দেরি হবে কে জানে!

আচমকা কেউ ওর একটা হাত ধরে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল। ফিরে তাকিয়েই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল অর্কর। কালো, ষন্ডামার্কা চেহারার একটা লোক চোখ লাল লাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাংগা লোকটা। এই তবে বিশে, কিন্তু চুল ছোট করে ছাঁটা, সাপের ফণাটা আর নেই।

ওর হাতে একটা মোচড় দিয়ে বিশে বলল, 'ব্যাপারখানা কি?'

'উঃ! আমার হাতে লাগছে,' অর্ক বলল, 'হাত ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব!' হাতটা পিঠের কাছে মুচড়ে এনে বিশে বলল, 'সেদিন ট্যাক্সিতে আমাদের পেছন নিয়েছিলে, আজ আবার এখানেও ধাওয়া করেছ!'

'আপনি কি সব বলছেন,' অর্ক সাহস করে বলল, 'আমি এখানে একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'অপেক্ষা করাচ্ছি, চল আমাদের সংগে।' অর্ককে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বস্তির দিকে নিয়ে চলল ওরা।

বস্তির কাছে আসতেই লোক জড়ো হতে শুরু করল।

'কি ব্যাপার বিশেদা?' কয়েকজন কমবয়সী ছেলে উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করল।

'আমাদের বস্তির কাছে ঘুরঘুর করছিল, মতলব ভাল নয় মনে হচ্ছে,' বিশে জবাব দিল।

'আমি মোটেই ঘুরঘুর করছিলাম না,' অর্ক প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল, 'আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'ফের মিছে কথা,' গর্জন করে উঠল বিশে।

'ভদ্দরলোকের ছেলের এই কান্ড,' একজন বলল, 'আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, একটু ইস্তিরি করে দিই।'

'না, আমিই দেখছি, তোরা একটু নজর রাখিস, ওর সংগে আরেকজন ছিল মনে হয়।'

অর্ককে বস্তির শেষ মাথায় একটা ঘরের সামনে এনে দাঁড়াল বিশে আর ঢ্যাংগা লোকটা। যারা পেছন পেছন আসছিল তাদের এক ধমক দিয়ে হটিয়ে দিল বিশে, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে।

দুটো ঘর। সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে বিছানা পাতা রয়েছে। তা ছাড়াও ঘরে আছে একটা পুরনো সোফা, দুটো লোহার চেয়ার আর একটা কাঠের গোল টেবিল।

ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বিশে, তারপর পাশের ঘরে গেল। কার সংগে যেন কথা বলল, অর্কর মনে হলো মেয়েলি গলা শুনতে পেল। বেরিয়ে এসে অর্কর দিকে তাকিয়ে বিশে বলল, 'এবার বল, এখানকার খোঁজ পেলে কেমন করে?'

'বলছি তো আমি একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম,' অর্ক জবাব দিল।

'হুঁ! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি।'

বিশে একটা শক্ত সরু কাঠি নিয়ে অর্কর ডান হাতের আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে চালান করল, তারপর আঙুলে চাপ

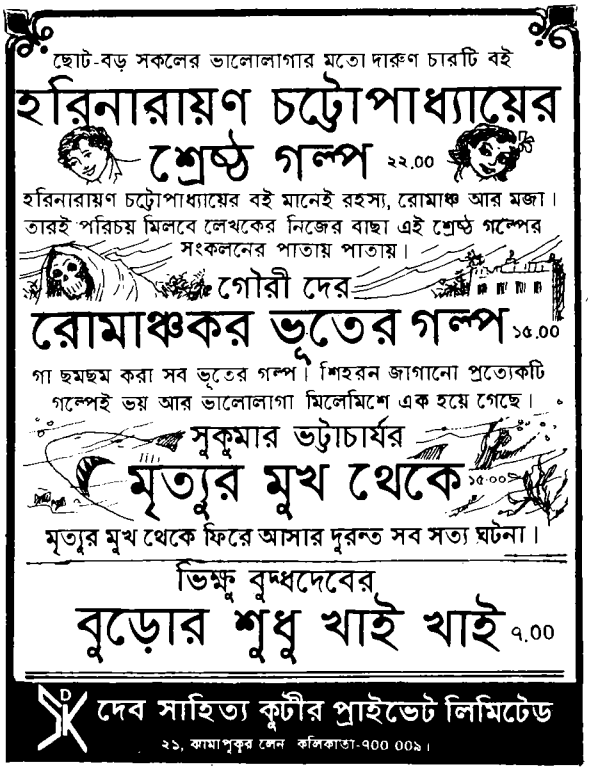

দিতে লাগল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল অর্ক।

'কি এখনও মিছে কথা বলবে?' বিশে দাঁত বার করে হাসল।

অর্ক ভেবে দেখল, ওর সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারলে বালচন্দ্রন ছেলেদের নিয়ে এসে পড়বে, মিছিমিছি নির্যাতন সহ্য করে লাভ নেই। ও বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।'

'পথে এসো বাবা,' ঢ্যাঙ্গা লোকটা এবার বলল, 'সেদিন ট্যাক্সিতে তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল, সে কোথায়?'

'সে আসেনি,' অম্লান বদনে বলল অর্ক।

'তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'আপনারা যে গলি দিয়ে ঢুকেছিলেন, আমরাও সেটা দিয়ে এসেছিলাম। ওখানকার কয়েকজন ছেলে আপনাদের আসতে দেখেছিল,' অর্ক বলল, 'আমি ট্যাক্সিতে সত্যিই আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। যে মেয়েটিকে আপনারা ধরে এনেছেন, তাকে আমি চিনি, তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

ওরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ঢ্যাঙ্গা বলল, 'তবে তো এর একটা বিহিত করতে হবে, ছেড়ে দেওয়া চলবে না।'

'সে পরে হবে,' বিশে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এ বস্তির খোঁজ পেলে কেমন করে?'

'আমি একটু গোয়েন্দাগিরি করতে ভালবাসি,' অর্ক বলল, 'তাই আপনাদের খোঁজে এখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম, একে ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম। এক বুড়িকে আপনার নাম আর চেহারার কথা বলতেই সে বলল এই বস্তিতে খোঁজ করে দেখতে। তাই ওই গাছটার তলায় এসেছিলাম।'

'আজই প্রথম জানতে পারলে?' ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিশে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ জানে না?'

'না।'

'সত্যি বলছ, না আবার দাওয়াই দেব?'

'না, না, সত্যি বলছি।'

বিশে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তারপর ঢ্যাঙ্গাকে বলল, 'ওর হাত-মুখ বেঁধে ফ্যাল। রাতে বস্তায় পুরে পুকুরে ফেলে দেব।'

অর্কর শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফগলা জল নেমে এল। কী সাংঘাতিক লোক! কেমন নির্বিকার মুখে বলল ওকে বস্তায় পুরে পুকুরে ফেলে দেবে। এত নিষ্ঠুর হয় মানুষ!

ওর হাত-মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

এতক্ষণে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সাতাশ আঠাশ বছরের একটি মেয়ে। গায়ের রঙ শ্যামলা, ছোট ছোট চোখ, একটু খাঁদা নাক, কিন্তু খুব স্বাস্থ্যবতী। সে ঘরে ঢুকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল অর্কর মুখের দিকে। অর্ক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'এই তবে সেই ছেলে,' সুবালা ক্যাট ক্যাট করে বলল, 'এই বয়সেই পাখনা গজিয়েছে!'

'তুমি ভেতরে গিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নেও,' বিশে বলল, 'ছেলেটার কথা কতদূর সত্যি কে জানে! আজ রাত্তিরেই সরে পড়তে হবে।'

'আপাতত খিদিরপুরে আমার ওখানেই থাকতে পার,' ঢ্যাঙ্গা বলল, 'দু-একদিনের মধ্যেই একটা ঘর খালি হবে শুনেছি। তার আগে এই ছিনে জোঁকটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'মেয়েটা বড় জ্বালাচ্ছে,' সুবালা বলল, 'আমি আর রাখতে পারছি না, ঘুমের ট্যাবলেট জলে গুলে খাইয়ে রাখতে হচ্ছে।'

'আর দু'দিন,' বিশে বলল, 'তারপর কেল্লা ফতে।'

অর্ক শিউরে উঠল। অতটুকুন মেয়েকে ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছে, মরে যাবে না তো!

ঠিক তখুনি বালচন্দ্রন এসে হাজির হলো ওখানে, সঙ্গে জনা দশেক তরুণ।

'কি ব্যাপার!' বস্তির লোকজন একে একে এসে জড়ো হতে লাগল।

'এখানে বিশে বলে কেউ থাকে?' তরুণদের একজন জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, কেন?' একজন বলল।

'আমাদের এক বন্ধুকে সে ধরে এনেছে। ওই রাস্তার ওপর যে দোকানগুলো আছে তাদের একজন দেখেছে।'

'ছেলেটা বদ মতলবে এখানে ঘোরাঘুরি করছিল,' বস্তির আরেকজন বলল।

'না, বিশে এক বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এনেছে, তার খোঁজেই সে এসেছিল,' তরুণদের একজন বলল।

'সে তো ওর বোনের মেয়ে,' একজন প্রতিবাদ করল।

'মিথ্যে কথা। আমরা এ পাড়ার ছেলে, দরকার হলে আরও লোকজন নিয়ে আসব।'

'এ কি জুলুম নাকি!' একজন মস্তান গোছের ছেলে এগিয়ে এল, 'ভদ্দরলোকের ছেলে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে! ভাল চাও তো সরে পড়।'

'আমরা জুলুম করতে আসিনি, পুলিশও এখুনি এসে পড়বে,' তরুণদের মধ্যে বলিষ্ঠ চেহারার একজন এবার বলল, 'ওই বিশে একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এনেছে, তার বদলে অনেক টাকা চাইছে। আর ক্যাবলা,' সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোকে আমি চিনি। সেবার বোমাবাজি করতে গিয়ে মার খেয়েছিলি, এর মধ্যেই ভুলে গেছিস।'

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিশে। তার হাতে একটা লাঠি। সে দু'হাতে লাঠিটা মাথার ওপর তুলে শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ভাগো সব এখান থেকে, নইলে আমি পেটাব বলছি। আমার কথা আর কাজ এক।'

তার মারমুখী ভাব দেখে বস্তির ছেলেরা ভরসা পেল। তরুণ দলকে ঘিরে ধরল। একটা রক্তারক্তি কান্ড ঘটে যায় আর কি, ঠিক সেই সময় কে একজন ছুটে এসে খবর দিল, পুলিশ। পুলিশের নাম শুনেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সেখানে এসে পড়লেন বেহালা থানার ও. সি.। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলভার, পেছনে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসছে একজন পুলিশ বাহিনী। টালিগঞ্জ থানার ও. সি. বালচন্দ্রনের ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেহালা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তখুনি ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তে অনুরোধ

করেছিলেন।

সামনের চুলটা কেটে ফেলায় বিশের মুখের আদলই বদলে গিয়েছিল, তবু ওকে চিনতে বালচন্দ্রনের ভুল হলো না। ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হি ইজ ওয়ান অফ দেম্।'

ও. সি. বিশের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, 'লাঠি ফেলে দাও।'

বাধ্য ছেলের মতো সে হুকুম পালন করল।

'তোমরা এখানে কি করছ?' তরুণ দলের দিকে তাকিয়ে ও. সি. জিগ্যেস করলেন।

'আমিই ওদের ডেকে এনেছি', বালচন্দ্রন এগিয়ে এল, 'আমি আর অর্কই এই কিড্‌ন্যাপারদের ফলো করেছিলাম, এই বস্তিটা আমরাই খুঁজে বার করেছি। এরা আমাদের বন্ধু, আমাদের হেল্প করতে এসেছে।'

'অর্ক কোথায়?' ও. সি. চারদিকে চোখ বুলোলেন।

'মনে হচ্ছে ওকে আটকে রেখেছে,' তরুণদের একজন বলল, 'ঘরের ভেতরটা দেখলে হয় না?'

ঠিক তখুনি মাথার ঘোমটা অনেকটা টেনে বাচ্চাকে কোলে করে সুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করল।

'বাচ্চাকে নিয়ে পালাচ্ছে,' বালচন্দ্রন চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যাচ হার!'

পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সুবালা। বাচ্চা তখন ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিশের দু'হাতে হাতকড়া পড়ল। ঢ্যাংগা লোকটা ওই ডামাডোলে কখন যে সটকে পড়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

ভেতরে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় অর্ক সব টের পাচ্ছিল। বালচন্দ্রনের কাজে ও খুব খুশি। পুলিশ ঠিক সময় এসে না পড়লে একটা বিচ্ছিরি কান্ড ঘটে যেত।

ও. সি. ওকে নিজের হাতে মুক্ত করে হাসিমুখে বললেন, 'তুমিই গোয়েন্দা অর্ক?'

অর্ক লজ্জা পেল।

'আরে তোমার বাহাদুরির কথা টালিগঞ্জের ও. সি.-র মুখে আমি শুনেছি, তিনি তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ নিজের চোখে তোমার কেরামতি দেখলাম। তোমাদের সাহায্য না পেলে বাচ্চাকে উদ্ধার করা সহজ হতো না।'

ও. সি. ওর পিঠ চাপড়ে আবার বললেন, 'বিশেকে আমি জানি, একবার লক্-আপে পুরেওছিলাম। ব্যাটা পাঁকাল মাছের মতো ধূর্ত, কিন্তু এই বাচ্চা চুরির ব্যাপারে একবারও ওর কথা মনে হয়নি। আসলে ও ছিনতাইবাজ, এত বড় একটা কান্ড করে বসবে ভাবতেই পারিনি। ব্যাটা আবার মাঝে মাঝেই ভোল পাল্টায়। কখনও সাপের ফণার মতো চুল, কখনও একেবারে কদমছাঁট। তা ছাড়া ওর আসল নাম গণেশ, পুলিশের খাতায় তাই আছে। বিশে নামটাও আমাদের ডিসিভ করেছিল। এই ঠিকানাটাও নতুন। আগে ছিল সব্জি পাড়ায়, সেখানেও গোলমাল করেছিল, পাড়ার লোকেরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

বেহালা থানায় অপেক্ষা করছিলেন টালিগঞ্জ থানার ও. সি. আর মিঃ বোস ও তাঁর স্ত্রী। বালচন্দ্রনের ফোন পেয়েই ও. সি. বেহালা থানাকে জানিয়ে দিয়ে মিঃ বোসের বাড়ি ছুটেছিলেন। মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা তাকে জড়িয়ে ধরে এমন কাঁদতে

'লাঠি ফেলে দাও।'

লাগলেন যে সবার চোখ সজল হয়ে উঠল।

মিঃ বোস দুই ও. সি.-র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেই, টালিগঞ্জ থানার ও. সি. অর্ক আর বালচন্দ্রনকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ ছেলে দুটির কাছে, ওরা না থাকলে আপনার মেয়েকে উদ্ধার করা এত সহজ হতো না। বিশেষ করে অর্ক যদি ওদের কাছে আপনার মেয়েকে দেখে সন্দেহ না করত, তবে কোথায় আমরা খুঁজে বেড়াতাম! ও বড় হলে একজন বড় ডিটেকটিভ হবে।'

'আমার সঙ্গে ওর কন্ট্রাক্ট আছে,' বালচন্দ্রন এক ফাঁকে মুখ খুলল, 'আমি হব ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট। যেমন শার্লক হোমসের ডাঃ ওয়াটসন।'

'আমার বাড়িতে কাল সন্ধ্যেবেলা আপনাদের সবার নেমন্তন্ন, সেখানে ওদের আমি পুরস্কার দেব,' মিঃ বোস গদগদ কণ্ঠে বললেন।

ফেরার পথে অর্ক বলল, 'তুই ঠিক সময় ওদের নিয়ে এসে না পড়লে আমাকে ওরা মেরেই ফেলত।'

'গোয়েন্দাদের অত সহজে মরতে হয় না,' বিজ্ঞের মতো জবাব দিল বালচন্দ্রন।

ছবি : সুফি

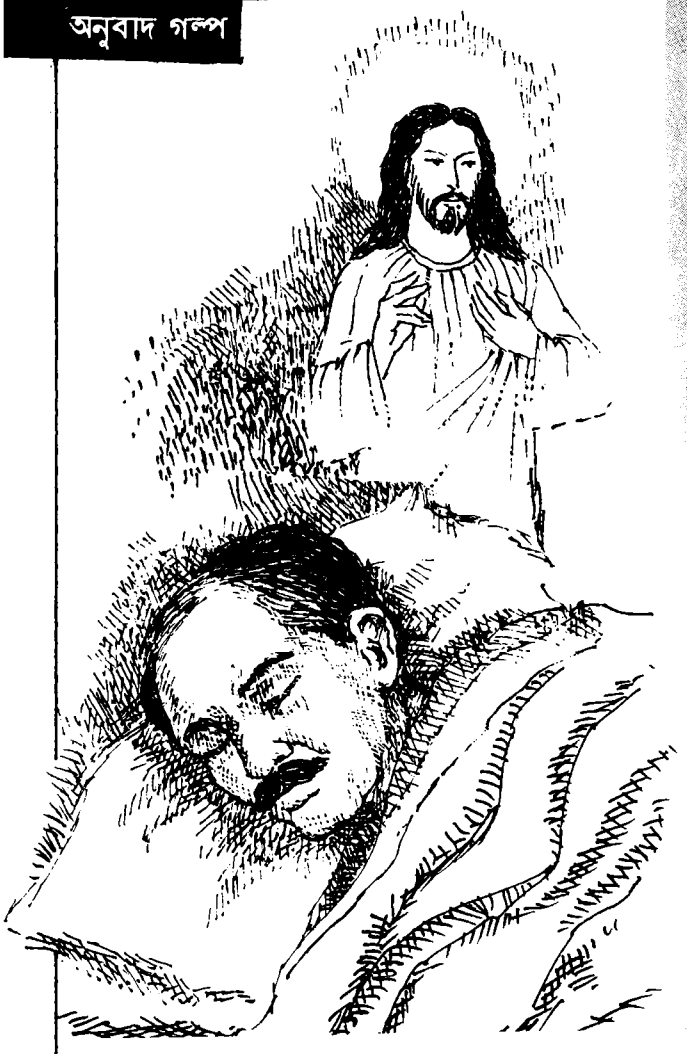

মারতিনের গল্প

গোরাচাঁদ পাল

মারতিন আভদেইচ নামে এক মুচির জীবনে দুঃখ এল, ভগবানের আশীর্বাদে সে এতদিন সুখেই ছিল, এবার দুঃখে পড়ল।

যে ঘরে সে বাস করত সেটা ছিল বাড়ির বেসমেন্টে। ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যেত। পথচারীদের সম্পূর্ণ না দেখা গেলেও তাদের পা দেখা যেত, তাদের পায়ের জুতো দেখা যেত।

তার এলাকার বেশির ভাগ মানুষই জুতোর ব্যাপারে তার কাছে আসত। জুতো তৈরি বা সারাইয়ের কাজে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সেই জন্যে মুচি হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

কিন্তু তার শেষ ছেলেটি মারা যাওয়ায় সে ভগবানের উপর ভীষণ রেগে গেল। মনে মনে বলল, হে ভগবান! আমি তো কারও কোনো ক্ষতি করিনি। তবে তুমি আমার এমন ক্ষতি করলে কেন! আমার শেষ ছেলেটাকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে!

শোকে দুঃখে ভগবানের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা ভাব সে নিজের মনে পুষে রাখতো।

একদিন এক বুড়ো তার কাছে এল। বলল, মারতিন! নানা তীর্থে ঘুরে আট বছর কাটালাম। এখন এয়িস্তা মঠে থাকি। সেখান থেকেই আসছি। সকলের কাছে কিছু কিছু সাহায্য চাইছি, তুমিও কিছু দাও।

মারতিন বুড়োকে সাধ্যমত সাহায্য দিয়ে বলল আপনি আট বছর তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন! শান্তি পেয়েছেন?

–শান্তি সে তো নিজের কাছে ভাই। মনেই শান্তি রয়েছে।

–সেকি! আমার তিনটে ছেলে মারা গেল, স্ত্রীও গত হলো। একটি ছোট ছেলে ছিল, সেও কয়েকদিন হলো মারা গিয়েছে। মনের জ্বালা আমি সহ্য করতে পারছি না! আমি মরতে চাই। আর এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না!

বুড়ো তার সব কথা শুনে বলল, এ কথা বলা উচিত নয়। বিধির বিধান বিচার করা অন্যায়। ভগবান যা করেন তা কখনই ভুল নয়। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তোমার ছেলে মরে যাবে আর তুমি বেঁচে থাকবে তবে জানবে তাতেই সবার মঙ্গল। তোমার দুঃখের কথা বলছো? সেটার কারণ হলো, তুমি তোমার নিজের সুখের জন্যে বাঁচতে চাও।

মারতিন বলল, মানুষ নিজের সুখের জন্যেই তো বাঁচতে চায় এটাই আমরা জানি।

–ভগবানের জন্যে বাঁচতে হয় মারতিন। তাঁর জন্যে বেঁচে থাকতেই তো ভগবান তোমাকে জীবন দিয়েছেন। তাঁর জন্যে বাঁচতে শেখো দেখবে তোমার দুঃখকষ্ট সবকিছু কত সহজ হয়ে গেছে।

–কিন্তু ভগবানের জন্যে কীভাবে বাঁচা যায়!

–বাইবেল পড়ো। তাহলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। জীবনের পথ চলার সাহায্য পাবে।

মারতিন বাইবেল কিনে পড়তে লাগল। কীভাবে ভগবানের জন্যে বাঁচতে হয় তা আস্তে আস্তে জানতে পারল। তার জীবনে এল পরিবর্তন। আগে সে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিত। বাজে গালগল্প করে সময় নষ্ট করত। এখন আর তা করে না। এখন সে বাইবেল পড়ে বোঝবার চেষ্টা করে।

সেন্ট লুকের উপদেশগুলোর একটি অংশ তার চোখে পড়ল।

'তোমার কাছে কেউ কিছু নিলে ফেরৎ চাইবে না। অপরের কাছে যে ব্যবহার আশা করবে তুমিও অপরকে সেই রকম ব্যবহার করবে।

সে যীশুর কথাও জানল, যে মানুষ আমার কথামতো কাজ করে না, সে কখনো ভাল পথের সন্ধান পায় না। সে কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে না।

যীশুর কথা মারতিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করল। তাঁর নির্দেশ, তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করল।

পাপীতাপীরা যখন প্রভুর পা চোখের জল দিয়ে ধুয়ে অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, তখন সেও নিশ্চয়ই তার এই প্রচন্ড দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে।

মারতিন ভগবানের চিন্তায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করল। বাইবেল পড়ে জানতে পারল, অতিথিরূপেই ভগবান ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান।

একদিন ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে বাইবেলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে সে যীশুকে দেখতে পেল! যীশু যেন বলছেন, মারতিন, কাল তুমি রাস্তার দিকে নজর রেখো, আমি আসব।

সকালে উঠে সে খাওয়া-দাওয়া সারল। তারপর অ্যাপ্রন এঁটে কাজে বসল। গত রাতের স্বপ্নের কথা বারবার তার মনে পড়তে লাগল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাই সে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতে লাগল।

যখনই অচেনা জুতো পায়ে কোনো পথচারীকে যেতে দেখছিল, উঠে গিয়ে তখনই ভাল করে তার মুখ দেখছিল। জুতো পায়ে বাড়ির কাজের লোকেরা গেল, ভিস্তিওয়ালা গেল। বুড়ো সৈনিক গেল। কোদাল হাতে বুড়ো সৈনিককে সে চেনে। নাম স্তোপানিচ।

তাকে ডাকল মারতিন, বলল, তুমিও বুঝি অন্যদের সঙ্গে বরফ সরাতে এসেছো?

স্তোপানিচ বলল, হ্যাঁ, মারতিন।

–তুমি তো সৈনিকের কাজ থেকে অনেকদিন অবসর নিয়েছো। বুড়োও হয়ে গেছো খুব, তবুও কাজ করছো!

–কী করি বল, এখন এই কাজ করেই রোজগার করি। পেটের খিদে তো মেটাতে হবে! ভীষণ ঠান্ডা লাগছে ভাই, একটু চা খাওয়াবে?

–নিশ্চয়ই, এসো আমার ঘরে।

মারতিন তাকে চা খাওয়ালো, আপ্যায়ন করল।

স্তোপানিচ বলল, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

মারতিন বলল, বরফ কাটার কাজ করছো, তা হলে তো এত শীতে তোমার ঠান্ডা লেগে জ্বর হতে পারে। শরীর আরও ভেঙে পড়বে।

শরীর ভাল রাখা, না রাখার মালিক ভগবান। তিনি যা করতে চান তাই করবেন।

মারতিনের তখনই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল! ভাবল, অতিথি সেজে যীশুও তো আসতে পারেন!

সে বলল, স্তোপানিচ! বাইবেলে পড়লাম, যীশু নাকি এক ফরাসীর বাড়িতে অতিথি হয়ে আসেন। কিন্তু ফরাসী লোকটা তাঁকে তেমন ভালভাবে অভ্যর্থনা জানায়নি। আমি হলে তাঁকে সারা হৃদয় দিয়ে আপ্যায়ন করতাম। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! স্বপ্নে দেখা দিয়ে যীশু বললেন, আজ আমার কাছে তিনি আসবেন, তাই অপেক্ষা করছি।

স্তোপানিচ যীশুর কথা শুনে খুশি হয়ে বলল, তাঁর ইচ্ছা হলে সব হয়। তিনি নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসবেন, দেখো! মারতিন বলল, তিনিই তো বলেছেন, যে বেশি মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, তার মাথা নত করে দিতে হবে। যে নত হয় তাকে বড় করতে হবে। যারা গরীব, ভদ্র, শান্ত, ভগবান তাদের সাহায্য করেন।

–ঠিক বলেছো মারতিন। স্তোপানিচ বলল। তারপর চা খেয়ে চলে গেল।

যীশুর উপদেশের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মারতিন আবার কাজে বসল।

জানলা দিয়ে দেখল, দুজন সৈনিক গেল। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক গেল। রুটিওয়ালা গেল। এরপর কত লোক গেল এল। তারপর এল একটি মেয়ে, তার কোলে একটা বাচ্চা।

মারতিন উঁকি মেরে দেখল, মেয়েটি অপরিচিতা, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। চোখে-মুখে অভাব-অনটনের ছাপ। এত ঠান্ডাতেও শীতবস্ত্রের কোনো বালাই নেই। কোলের বাচ্চাটা শীতে কাঁপছে। মেয়েটিও শীতে অবসন্ন।

মারতিনের মন দুঃখে ভরে গেল। উঠে গিয়ে সহানুভূতিভরা গলায় ডাকল, আমার ঘরে আসুন। ঐখানে চুল্লীর পাশে দাঁড়িয়ে একটু গরম হয়ে নিন। বাচ্চাটাকে কিছু খেতে দিন।

কাতরস্বরে মেয়েটি বলল, দুধ কেনার সাধ্যি নেই, কী খাওয়াব! সকাল থেকে আমিও কিছু খাইনি।

মারতিন উনুনের ধার থেকে বাঁধাকপির সুপ আর রুটি এনে দিল তাকে। বাচ্চাটাও সুপ খেয়ে কান্না থামাল।

মেয়েটি রুটি খেয়ে সুস্থ হলো। বলল, আমার স্বামী একজন সৈনিক। কোথায় যে চলে গেলেন! আট মাস হলো কোনো খবর পাইনি। আমি এক বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করতাম। সেখানেই থাকতাম। এই ছেলেটা কোলে আসায় ঐ চাকরিটা গেছে। কোথাও থাকতেও পাই না আর ছেলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাই। আমাদের গ্রামের এক বৌয়ের কাছে শুনলাম, এখানে কোথায় নাকি চাকরি আছে। তাই খুঁজতে এসেছিলাম। এক জায়গায় কথা হয়েছে এক সপ্তাহ পরে চাকরিটা পাব। কিন্তু আমি এখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কোথায় যাই ভেবেই পাচ্ছি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মারতিন জিজ্ঞাসা করল, গরম জামা আছে?

মেয়েটি বলল, কী করে থাকবে? শেষ সম্বল একটা কম্বল ছিল। দুদিন আগে বাঁধা দিয়েছি।

মারতিনের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটা পুরোনো কোট ছিল। মারতিন সেটা মেয়েটিকে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে বাচ্চাটাকে অন্ততঃ শীতের হাত থেকে বাঁচান।

মেয়েটি কোটটা হাতে নিয়ে কেঁদে ফেলল, বলল, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমার বাচ্চাটা শীতে জমে যাচ্ছিল। আপনার দয়ার কথা মনে থাকবে।

মারতিন বলল, ভগবানের ইচ্ছাতেই আপনার উপকারে আমি এলাম। এই নিন কিছু রুবল, পারেন তো দোকান থেকে আপনার কম্বলটা ছাড়িয়ে নেবেন।

মেয়েটি রুবলগুলো নিয়ে কোটটা বাচ্চাটার গায় ভালভাবে

জড়িয়ে চলে গেল।

মারতিন আবার কাজে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে সে দেখল সেই বুড়িকে, যে আপেল বিক্রী করে। তার ঝুড়িতে তখনও কয়েকটা আপেল ছিল। বুড়ি মারতিনের বাড়ির সামনে এসে বসল। ঝুড়ির আপেলগুলো গোছাতে লাগল।

ঠিক এমন সময় একটা ছেলে সুযোগ বুঝে একটি আপেল নিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বুড়ি ছেলেটাকে ধরে ফেলল। বলল, আমার আপেল চুরি করছিলি! এত বড় সাহস! চল্ তোকে আজ পুলিশের হাতে তুলে দেব। তোর একদিন কি আমার একদিন!

ব্যাপার দেখে মারতিন বুড়ির কাছে এসে বলল, দিদিমা, ওকে ছেড়ে দাও। যীশুর দোহাই, ওকে ক্ষমা করে দাও।

বুড়ি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না। বলল, ছেলেটাকে এমন শিক্ষা দেব, জীবনে আর চুরি করবে না। চল্ থানায়। তোকে জেলে পুরে তবে ছাড়ব।

মারতিন আরও অনুনয়-বিনয় করল। তাতেই বুড়ি শান্ত হলো। ছেলেটাকে ছেড়ে দিল।

ছেলেটা ছাড়া পেয়ে চলে যাচ্ছিল, মারতিন তাকে ডাকল, বলল, দিদিমার কাছে ক্ষমা চাও। কখনও এমন কাজ করবে না। তখন মারতিন বুড়ির আপেলগুলো থেকে একটি আপেল তুলে ছেলেটিকে দিল।

বুড়ি বলল, দাম দিতে হবে কিন্তু।

মারতিন বলল, দাম নিশ্চয়ই দেবো। এই নাও।

বুড়ি দাম নিয়ে বলল,এমনভাবে আস্কারা দিলে যে ছেলেটা গোল্লায় যাবে!

মারতিন বলল, ভগবান বুদ্ধিহীনদের,ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষমা করতে বলেছেন। তা না হলে তিনিও তো আমাদের ক্ষমা করবেন না।

বুড়ি কেমন যেন হয়ে গেল। সে বলল, আমারও নাতি-নাতনী আছে। আমার তো আর তেমন শক্তি নেই, অথচ তাদের জন্যেই আমি প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছি। ছোট্ট নাতনি অ্যানী আমার বড্ড আদরের। বুড়ি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, বড় ছেলেমানুষী করে ফেললাম। ছেলেটাকে অমনভাবে বকুনী দেওয়া ঠিক হয়নি।

বুড়ি তার ঝুড়িটা পিঠে তুলতে যাবে, এমন সময় ছেলেটা বলল, দিদিমা! ওটা তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে দাও। আমিও তো ওদিকেই যাব।

বুড়ি ছেলেটার মাথায় বোঝা চাপিয়ে কোথায় চলে গেল।

মারতিন আবার নিজের কাজে মন দিল। ক্রমে সন্ধ্যা হলো। যন্ত্রপাতি গুছিয়ে সে উঠে পড়ল। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতে বাইবেল পড়তে বসল।

কিন্তু ও কি, কোথায় যেন কারা ফিস্‌ফিস্ করে কি বলছে! কি বলছে তারা! মারতিনের কানে চুপি চুপি বলছে, মারতিন, আমায় চিনতে পেরেছো তো? অন্ধকার কোণ থেকে স্বরটা ভেসে এল যেন। বলল 'আমি।' তখনই মারতিনের চোখের সামনে দিয়ে বাচ্চা কোলে মেয়েটা চলে গেল।

আবারও সেই কণ্ঠ ভেসে এল, বলল, 'আমি'। এবারে সেই বুড়ি তার আপেলের ঝুড়িটা ছেলেটার মাথায় তুলে দিয়ে চলে গেল।

মারতিন যেন শুনতে পেল, সেই কণ্ঠস্বরই বলছে, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমাকে খাদ্য দিয়েছো, অপরিচিত হলেও আশ্রয় দিয়েছো, সেবা করেছো, অকাতরে দান করেছো।

এক অনাবিল আনন্দে মন ভরে গেল মারতিনের। দেখল, কখন কোন অজানা মুহূর্তে সে বাইবেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু দুঃখের সাগরে একটা চমৎকার সুন্দর পালতোলা সুখের নৌকা এসে ওকে আনন্দময় প্রশান্তিময় কোনো এক সাম্রাজ্যে পৌঁছে দিল। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট সবকিছুকে যেন আজ নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পেল। উপলব্ধি করতে পারল।

[লিও টলস্তয়ের 'হোয়্যার লাভ ইজ, গড ইজ' গল্প অবলম্বনে]

ছবিঃ নিমাই দাস

স্বপ্নের ফিরিওলা

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভোলাভালা প্রাণখোলা এক ছিল ফিরিওলা
ডাকতো সে নানা সুরে, ঠিক যেন হরবোলা।
গরমের রোদ্দুরে মেলে দিতো কোন ছায়া–
বিষ্টির মিঠে বোলে এনে দিতো মেঘ মায়া।
হাসতো সে অবিরল ঝরনার সুর তোলা,
সেই হাসি সবখানে বুনে দিতো ফিরিওলা।

নীল মেঘে পেঁজা তুলো, কাশফুলে রোদ বোনা
শরতের বাঁশী তার সুরে হোতো উন্মনা।
লম্বা ছুটির খাম সেই দিতো হাতে হাতে,
আবার শিউলি ফোটা জোছনার ভরা রাতে
মুঠো-মুঠো স্বপ্নে সে হৃদয়েতে দিতো দোলা–
আকাশের ছায়াপথে দেখা দিতো ফিরিওলা।

ঝাপসা শীতের ভোরে শিশিরের কুঁড়িগুলি
ঘাসের বুকের থেকে কখন সে নিতো তুলি।
গাঁদাফুলে রঙ ছুঁয়ে খেয়ালী সে যেন কবে
এনে দিতো কুহু তান, ফুলেদের উৎসবে।
আকাশের মতো তার নিঃসীম প্রাণখোলা–
স্বপ্নের দেশ থেকে আসে সেই ফিরিওলা।

ছবিঃ সুফি

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। সমুদ্রে থাকে অথচ হাতির মতো দুটো লম্বা দাঁত ও বেড়ালের মতো গোঁফ আছে। প্রাণীটি কি?

২। দেশ জুড়ে টি ভি প্রোগ্রাম প্রচার করতে কোন উপগ্রহটি সাহায্য করে?

৩। চার্চিলের পুরো নাম ছিল উইনস্টন এস. চার্চিল। 'এস'টা কি নামের আদ্যক্ষর?

৪। হাড়গোড়ের মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যা গাছপালার পুষ্টি যোগায়। পদার্থটি সোডিয়াম, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, না পটাসিয়াম?

৫। 'গজলের রানী' কাকে বলা হতো?

৬। হরগোবিন্দ খোরানা, এস. চন্দ্রশেখর, সি. এস. নাইডু ও রঙ্গস্বামীর মধ্যে পদার্থ বিদ্যায় কে নোবেল পুরস্কার পান?

৭। ভারতবর্ষে সবথেকে বড় শিল্প কোনটি–বিমান, জাহাজ, বস্ত্র না মোটরগাড়ি তৈরির শিল্প?

৮। কোন দেশটিকে একসময় বলা হতো 'ওয়েমার রিপাবলিক'?

৯। নিজের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে যে পদার্থ অন্য জিনিসের রাসায়নিক পরিবর্তনে সাহায্য করে তাকে কি বলে?

১০। 'হারলেম গ্লোব ট্রটারস' বিশ্বের মানুষকে কি খেলা দেখিয়ে চমৎকৃত করেছেন?

১১। ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড ও বিউট্রিক অ্যাসিড আমাদের রোজকার বিভিন্ন খাবারের মধ্যে পাওয়া যায়। কি কি খাবারের মধ্যে এগুলি আছে?

১২। 'সান্টা মারিয়া' জাহাজে চড়ে কোন বিখ্যাত অভিযাত্রী ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছান?

উত্তর ঃ

১। সিন্ধুঘোটক।

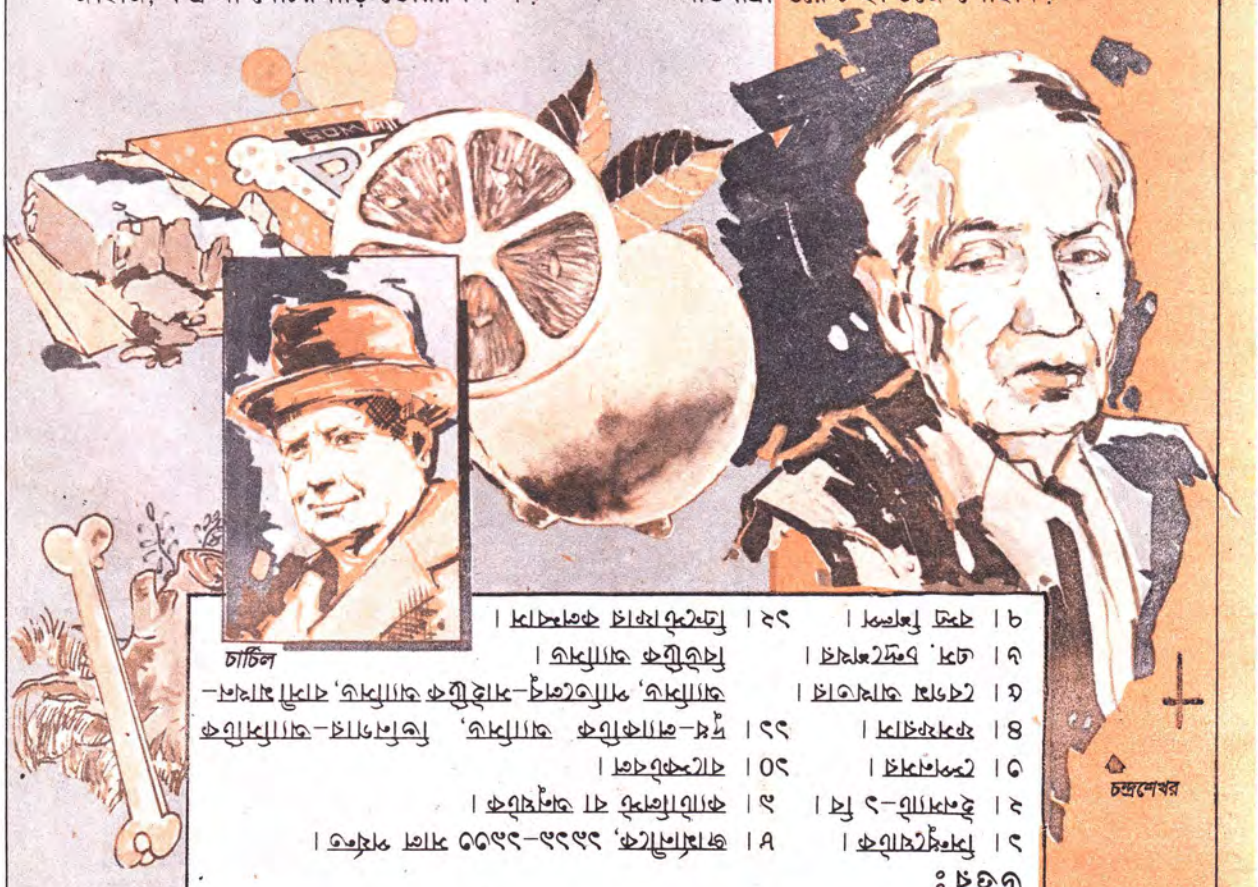

২। ইনস্যাট–১ বি।

৩। স্পেনসর।

৪। ফসফরাস।

৫। বেগম আখতার।

৬। এস. চন্দ্রশেখর।

৭। বস্ত্র শিল্প।

৮। জার্মানীকে, ১৯১৯–১৯৩৩ সাল পর্যন্ত।

৯। ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক।

১০। বাস্কেটবল।

১১। দুধ–ল্যাকটিক অ্যাসিড, ভিনিগার–অ্যাসিটিক অ্যাসিড, পাতিলেবু–সাইট্রিক অ্যাসিড, বাসী মাখন–বিউট্রিক অ্যাসিড।

১২। ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

ছবি ঃ রজতবরণ চক্রবর্তী

সহ খেলোয়াড়দের সহযোগিতা ছাড়াই বিলি সেদিন দারুণ খেললো

বিলির বুট

(৪৬)

ডেড সটের বুট পরে খেললেই বিলির খেলা একেবারে ডেড সট কিনের মতো হয়ে যায়। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসে বিলি হলিডে ক্যাম্পের কর্তার চোখে পড়ে গেলো। তিনি বিলি আর তার ঠাকমাকে ক্যাম্পে নিয়ে এলেন। কিন্তু ক্যাম্প দলের খেলোয়াড়রা বিলিকে খেলতে দিতেচায় না। তবু বিলি খেলছে। তাই ওরা ঠিক করলো বিলিকে একটা বলও দেবে না। কিন্তু বিলি হঠাৎ বল পেয়ে গেলো....

কর্ণার থেকে উড়ে এলো বলটা।
গোলি পাঞ্চ করে ফিরিয়ে দিলো বলটা
জাপপপপ!
দারুণ বাঁচিয়েছে!
কিন্তু বলটা সোজা বিলির কাছে চলে গেলো....
গোওওললল
উঃ কি দুর্দান্ত শট!
বুঝতেই পারছি, এই জনোই বুটটা আমায় এখানে টেনে এনেছিলো।
হলিডে ক্যাম্পের ছেলেরা ভালোই খেলছে।
দারুণ সেভ!
বিলি বলটার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে এসেছিলো।
আবার গোল.... সেই ছেলেটাই গোল করেছে।
গোলরক্ষকের কাছে বলটা আসার আগেই বুটটা এই জনোই আমায় ছুটিয়ে এনেছিলো!
একটু পরেই খেলা শেষ হয়ে গেলো....
ওরা নিশ্চয়ই বিলিকে কাঁধে করে নিয়ে আসবে। এমন একটা হ্যাটট্রিক করেছে ও.....
একটা কিছু গোলমাল হয়েছে....আমায় দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি!
তখন সাজঘরে....
তিনটে গোল করেছো বটে... তবে আমরা তোমায় ফাইনালে কিছুতেই খেলতে দেবো না....
সব থেকে ভালো হয় যদি তুমি জিনিসপত্তর নিয়ে ক্যাম্প থেকে কেটে পড়ো।
সন্ধ্যেবেলায় বিলি যখন ওর ঠাকমার সঙ্গে খেতে বসেছে তখন....
এই চিঠিটা ওরা তোমায় দিতে দিয়েছে.....
তুমি বেশ চটপট বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছো দেখছি.... ভালো.....
ধন্যবাদ!
চিঠির নির্দেশ মতো বিলি একটু পরে বাইরে বেরিয়ে এলো....
আশ্চর্য! চিঠি দিয়ে কে আমাকে এই নির্জন জায়গায় টেনে আনলো? কেন
ঠিক তখনই....
এমন মার মারো যাতে ফাইনালে ও আর খেলতে না পারে!
ঐ যে এসে গেছে....
ঠিক ডেড সটের মতো.... ওর জীবনেও তো এই রকম ঘটনা ঘটেছিলো....ডেড সটের মতো আমাকেও রুখে দাঁড়াতে হবে।
কি হবে এবার? বিলি কি পারবে ওদের সঙ্গে? জানতে পারবে পৌষ সংখ্যায়।

সত্যি !

স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?

মার্ক টোয়েনকে কে না চেনে। অল্প বয়সে তিনি এবং তাঁর ভাই হেনরি স্টিমারে কাজ করতেন। মিসিসিপি নদীতে সেন্ট লুই আর নিউ অরলিন্সের মধ্যে স্টিমারগুলো যাতায়াত করত। একবার সেন্ট লুইয়ে বোনের বাড়িতে মার্ক টোয়েন রাতে স্বপ্ন দেখেন, ওই বাড়িরই বসার ঘরে চেয়ারের ওপর ধাতুর তৈরি একটা কফিন রাখা আছে। তার মধ্যে শোয়ান রয়েছে হেনরির মৃতদেহ। হেনরির বুকের ওপর একটা ফুলের স্তবক রাখা আছে যার ঠিক মধ্যিখানের ফুলটা লাল রংয়ের। ঘুম ভেঙে গেলে মার্ক টোয়েন ভাবেন, ব্যাপারটি বুঝি সত্যি। কিন্তু খানিকক্ষণ পর তিনি বুঝতে পারেননি তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি তাঁর এই স্বপ্নের কথা তাঁর বোনকেও বলেন।

কয়েক সপ্তাহ পর দুভাই নিউ অরলিন্স থেকে আলাদা দুটো স্টিমারে সেন্ট লুই যাত্রা করেন। হেনরি যে স্টিমারে ছিল, মাঝপথে মেমফিস বলে একটা জায়গায় তার বয়লার ফেটে বহু যাত্রী মারা যায়। হেনরিও গুরুতরভাবে আহত হয় এবং কিছুদিন পর হাসপাতালে মারা যায়। মার্ক টোয়েন শেষবারের

মতো ভাইকে দেখতে এসে লক্ষ্য করেন স্বপ্নে তিনি যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি ধাতুর তৈরি কফিনে হেনরি শুয়ে আছে। আসলে মেমফিসের কিছু মহিলা দয়াপরবশ হয়ে ছেলেমানুষ হেনরির জন্য ধাতুর কফিন কিনে দেন। কিন্তু স্বপ্নে দেখা ফুলের স্তবকটা ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে তাও এসে গেল। মার্ক টোয়েন থাকতে থাকতেই এক মহিলা এসে হেনরির বুকের ওপর একটা সাদা ফুলের স্তবক রাখেন। স্তবকের মাঝখানে একটা লাল গোলাপ।

যমজ

যমজ দুটি ছেলে দুটি আলাদা পরিবারে আশ্রয় পায়। উনচল্লিশ বছর পরে তারা মিলিত হয়ে আবিষ্কার করে তাদের নাম, জীবিকা, পছন্দ, এমনকি স্ত্রী ও সন্তানের নামও এক। দুই ভাই দুটি কুকুর পুষেছিল। দু'জনের কুকুরের নামই টয়। আর দু'জনেই ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবার্গ সমুদ্রতটে ছুটি কাটাতে ভালোবাসে।

দুই প্রেসিডেন্ট

আব্রাহাম লিংকন ও জন ফিটজিরাল্ড কেনেডির মধ্যে অদ্ভুত রকমের কিছু মিল ছিল। যেমন দুজনেই আমেরিকার নিগ্রোদের সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতেন। দুজনেই মারা যান শুক্রবার। দুজনকেই মাথায় গুলি করা হয়। হত্যার সময় লিংকন ও কেনেডির স্ত্রী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আব্রাহামকে হত্যা করা হয় ফোর্ড থিয়েটারে। আর কেনেডিকে মারা হয় যখন তিনি ফোর্ড কোম্পানির তৈরি একটা লিংকন কনভারটিবেল করে যাচ্ছিলেন তখন।

তাঁদের মৃত্যুর পর দেখা যায় দুবারই ভাইস প্রেসিডেন্ট দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের দুজনের পদবীই ছিল জনসন। তাঁরা ছিলেন দক্ষিণ অঞ্চলের ডেমোক্রাটিক পার্টির লোক। ভাইস প্রেসিডেন্ট হবার আগে দুজনেই ছিলেন সেনেটর। আরো আশ্চর্যের কথা এন্ড্রু জনসনের ঠিক একশ' বছর পরে লিন্ডন জনসনের জন্ম হয়। যেমন লিংকনের হত্যাকারী বুথের একশ' বছর পর জন্মায় কেনেডির হত্যাকারী অসওয়াল্ড। আবার লিংকন ও কেনেডির প্রেসিডেন্ট হবার মধ্যেও ছিল এই একশ' বছরের ব্যবধান।

লিংকনের হত্যাকারী জন উইলকিস বুথ আর কেনেডির হত্যাকারী লি হার্ভে অসওয়াল্ড দুজনেই ছিল দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। তাদের বিচারের আগে দুজনেই মারা যায়। বুথ লিংকনকে থিয়েটারে হত্যা করে একটি খামারবাড়িতে লুকোয়। অসওয়াল্ড একটি গুদামঘর থেকে গুলি চালিয়ে কোনো এক থিয়েটারে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল।

এ ছাড়া আরো কিছু আশ্চর্য মিল পাওয়া যায় দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে। লিংকনের ব্যক্তিগত সচিবের নাম ছিল জন। আর কেনেডির ব্যক্তিগত সচিবের পদবী ছিল লিংকন। লিংকন ও কেনেডি দুটি নামের ইংরেজি বানানে প্রত্যেকটিতে আছে ঠিক সাতটি করে অক্ষর। যেমন এন্ড্রু জনসন ও লিন্ডন জনসন-এর বানানে আছে তেরোটি অক্ষর। আর দুই হত্যাকারীর পুরো নামে আছে পনেরোটি করে অক্ষর।

ছবি : সুফি

বাহাদুর বেড়াল

বাদ্যযন্ত্রের দোকান
আমি একটা হুইস্‌ল্ কিনবো।
এই বাঁশী নয় কেন, বাহাদুর আমি এটা দিয়ে কি করতে পারি দেখে তুমি খুশি হবে!
মরেছে! এযে অতি চালাক গুলে।
ওয়াহ্!
তোমার ঐ চ্যাঁচানি ভুল স্বরলিপিতে হয়েছে।
এই ভোঁপপর বাঁশীতে নিচু পর্দায় চেষ্টা করো!
গ্লুগল্!
শয়তান, গুলে! আমাকে দেখাতে দাও আমি কি করে হার্প বাজাই।
হাঃহাঃ! ও লক্ষ্য করেনি যে ওর মনিব ভেতরে আসছেন!
ম্যানেজার
ছ্যাড়াং!
অতি চাল্যাকের চাকরি ফট্!

পয়সার খেলা

যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

ছবি ঃ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। বন্ধুর মেয়ে আমায় বললো, আঙ্কেল তুমি পয়সা দিয়ে ম্যাজিক দেখাতে পারো। আমি বললাম, পারি। ও বললো, তাহ'লে দেখাও। আমি পকেট থেকে পয়সা বের করলাম....

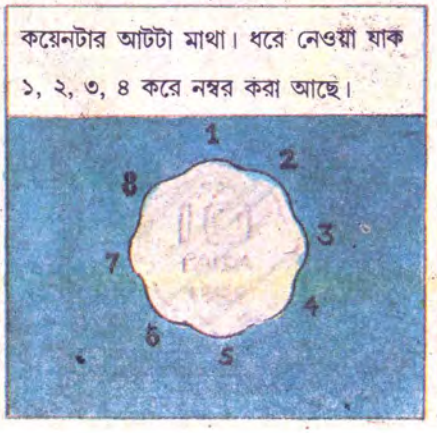

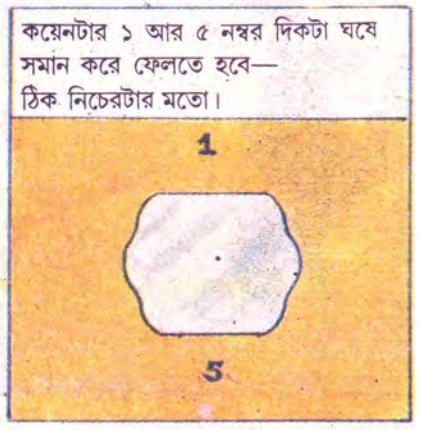

এই রকম দেখতে হবে। এখন ৩ আর ৭ নম্বর মাথা দুটো যদি এইভাবে চেপে ধরা হয় তাহ'লে....

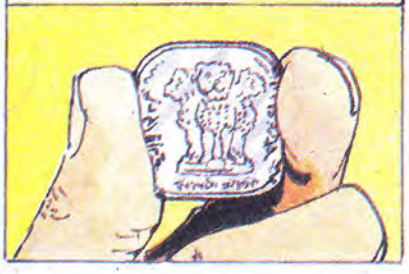

এটা একটা পাঁচ পয়সার কয়েন বলেই মনে হবে। বাঁ হাত থেকে এবার যদি...

কয়েনটাকে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ১ আর ৫ নম্বর মাথায় চাপা দিয়ে ধরা হয় সমান্তরালভাবে....

তাহলে ডান হাতে ধরা কয়েনটা নিজের দিক থেকে এই রকম দেখতে লাগবে...

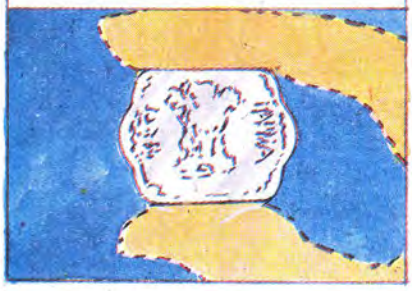

আর দর্শকরা অবাক হয়ে দেখবে, কয়েনটা দশ পয়সার হয়ে গেছে...

১ আর ৫ নম্বর মাথা দুটো কিন্তু এই ভাবে চাপ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে...

পয়সাটা বাঁ হাতে যখন ছিলো তখন অশোক স্তম্ভ সামনে... যেই ডান হাতে নিলে ওটা হয়ে গেলো উল্টো।

এইটাই ম্যাজিক। যখনই বাঁ হাত থেকে ডান হাত কিংবা উল্টোটা করবে...

তখনই কিন্তু কয়েনটার এপিঠ ওপিঠ বদলে যায়। আলাদা করে ঘুরিয়ে নেবার দরকার হবে না।

এই খেলাটির জন্যে একটা দশ পয়সা ঘষে ম্যাজিকের পয়সা করে রাখতে হবে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে যাতে তাঁরা ভাবেন তোমার কাছে একটাই পয়সা আছে। তারপর... সেটা চট করে বদল করে নেবে তোমার ম্যাজিক পয়সার সঙ্গে।...

কি কেমন লাগলো ম্যাজিকটা? মনে রেখো যদি পাঁচ পয়সা দিয়ে ম্যাজিকটা শুরু করো তাহলে শেষ করবে দশ পয়সা দিয়ে!

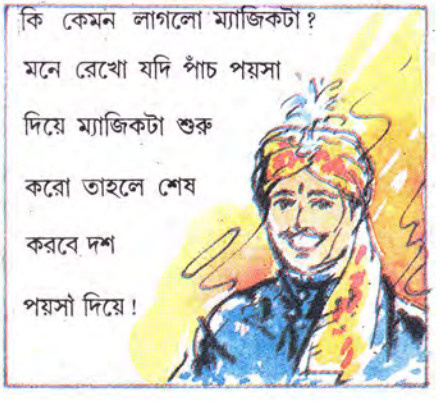

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

সস্তায় তেল

না তৈল মর্দন নয়। যাতে আমরা বেশি করে এবং সস্তায় তেল পেতে পারি তার জন্য সব সময় গবেষণা করছিলেন টাটা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (TERI) বিজ্ঞানীরা। চাষযোগ্য সরিষা যার পোশাকী বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্রাসিকা নিগ্রা, সেগুলিতে রোগ এবং পোকা ধরে তাড়াতাড়ি। ফলে ফসল কম হয়। তেলের দাম বাড়ে। টেরি বিজ্ঞানীরা বিশেষ এক ধরনের ব্রাসিকা নিগ্রার সঙ্গে তারই স্বজাতি এক বুনো সরিষার মিলন ঘটিয়ে তৈরি করেছেন নতুন এক ধরনের সরিষা। নাম দিয়েছেন ব্রাসিকা অলারেসি। এই নতুন সরিষা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। সহজে এদের পোকামাকড় আক্রমণ করতে পারে না। ফলনও অনেক বেশি। আর তার মানেই তেলের দাম সস্তা।

বাতাস থেকে বিদ্যুৎ !

সভ্যতার চাবিকাঠি শক্তি। শক্তি উৎপন্ন করা হয় বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী থেকে। জ্বালানীগুলির মধ্যে কয়লা আর তেলই প্রধান। উপসাগরীয় যুদ্ধ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তেলের অভাব কত সংকট সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎও একরকম শক্তি। কিন্তু এটা উৎপন্ন করার জন্যও চাই নানারকম জ্বালানী। সেগুলি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করাও খুব খরচের ব্যাপার। কিন্তু বাতাস থেকে বিদ্যুৎ ! সেটা যদি সম্ভব হয় ? হ্যাঁ, এটাও সম্ভব। অনেক সস্তায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ব্রিটিশ ভার্টিকাল অ্যাক্সিস উইন্ড টারবাইন ৮৫০ (VAWT 850) দক্ষিণ ওয়েলস-এর ৬০০টি পরিবারের বিদ্যুতের সমস্ত প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ৪৩ মিটার উঁচু এই বাতাসস্তম্ভ জেনারেটারটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় উইন্ড টারবাইন। ছবিতে টাইবাইনটি দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি লাদাখের নামব্রা উপত্যকায় ১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে সেরকম একটি বাতাসস্তম্ভ জেনারেটর বসানো হয়েছে। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনও শুরু করেছে।

বার হাত কাঁকুড়ের....

তের হাত বীজ ! রূপকথার গল্প। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একধরনের পোকা বোম্বারডিয়ার বিটল্‌স-এর ক্ষেত্রে কথাটা একটু অন্যভাবে প্রমাণ করেছেন। এই পোকাটি আত্মরক্ষার জন্য যে জৈবনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটি বড় অদ্ভুত। এই পদ্ধতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা সিক্সথ রকেটে ব্যবহার করেছিল। পোকাটি ভয় পেলে তার উদরের পেছনের দিকের একটি ছিদ্র দিয়ে জোরে একটি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেয়। মজার ব্যাপার এই যে মাত্র দু সেন্টিমিটার লম্বা এই পোকাটি ঘণ্টায় তেতাল্লিশ কিলোমিটার বেগে রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে দেয়। সেই সময় একটা সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এই শব্দেও পোকাটির শত্রুরা ভয় পেয়ে পালায়।

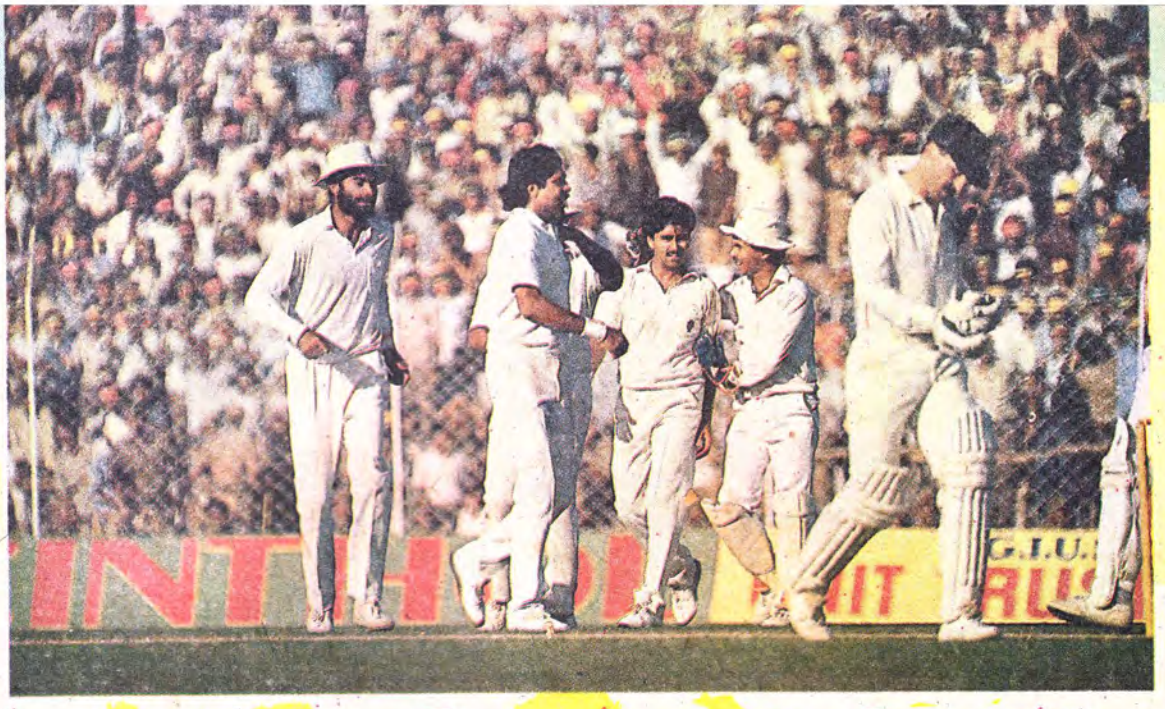

এখন শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিকেটের আসর এখন জমজমাট। বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে আসছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসবে। তার জন্যে সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে প্রস্তুতিপর্ব। ভারতও চুপ করে নেই। ভারত এখন অস্ট্রেলিয়ায় গেছে। টেস্ট ম্যাচ, একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, বেনসন হেজেস কাপ– সবই খেলবে ভারত।

ভারত এবার নিয়ে ছবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেলো। ভারত প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলো ১৯৪৭-৪৮ সালে। লালা অমরনাথ ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার ভার তখন ছিলো ডন ব্রাডম্যানের কাঁধে। ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়া এসেছিলো ভারতে। ইয়েন জনসন আর রে লিন্ডওয়ালের ওপর সেবার ভার পড়েছিলো অস্ট্রেলিয়া দল পরিচালনার। পলি উমরিগড় ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া রিচি বেনোর নেতৃত্বে ভারতে খেলতে এলো। জি. এস. রামচাঁদ তখন ভারতের অধিনায়ক। ১৯৬৪ সালে আর. বি. সিম্পসন দলবল নিয়ে আবার ভারতে এলেন। মনসুর আলি পাতৌদি তখন ভারতের দলনেতা। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারত গেলো অস্ট্রেলিয়ায়। সিম্পসন আর লরি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। সেবার ভারতীয় দল পরিচালনা করেছিলেন চান্দু বোরদে আর মনসুর আলি পাতৌদি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়া এলো ভারতে। দু দলের অধিনায়ক ছিলেন মনসুর আলি পাতৌদি আর বিল লরি। ১৯৭৭-৭৮ সালে বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারত গেলো অস্ট্রেলিয়ায়। ববি সিম্পসন তখনো অস্ট্রেলিয়ার দলনেতা। ১৯৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়া এলো ভারতে। সুনীল গাভাসকার আর কিম হিউজ ছিলেন দু দেশের অধিনায়ক। ১৯৮০ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেলো। জি. এস. চ্যাপেল ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আর গাভাসকার ভারতের। ১৯৮৫-৮৬ সালে ভারত আবার গেলো অস্ট্রেলিয়ায়। অ্যালান বর্ডার আর কপিলদেব ছিলেন দু দেশের অধিনায়ক। ১৯৮৬ সালে দু দেশের মধ্যে শেষ বার খেলা হলো। অ্যালান বর্ডারের নেতৃত্বে ভারতে এলো অস্ট্রেলিয়া। ভারতের অধিনায়ক তখন কপিলদেব। তারপর এবার আবার ভারত গেলো অস্ট্রেলিয়ায়। মহম্মদ আজহারউদ্দিন তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার পর বিশ্বকাপে খেলে সেই মার্চ মাসে দেশে ফিরবেন তিনি। টেস্ট আর একদিনের খেলায় আজহারউদ্দিনের সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্যে তাল ঠুকছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার।

বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর উপকার অপকার দুইই করবে। ভারতীয় দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাননি। তাঁরা বিশ্বকাপের আগে ঐ দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি আর মাঠগুলোর সঙ্গে দিব্যি পরিচিত হয়ে উঠবেন। উপকারই হবে এতে। আর অপকার বলতে বলা যায় খেলে খেলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা না ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নভেম্বর মাস থেকেই তো এই সফর শুরু হচ্ছে। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি বিশ্বকাপে ভারতের খেলার ওপর প্রভাব না ফেলে। ভারতের বেশির ভাগ

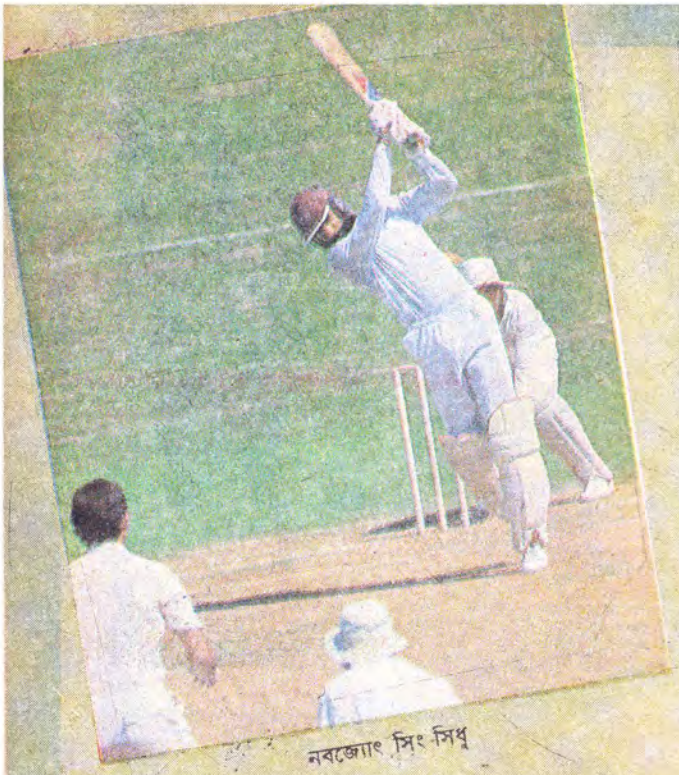

নবজ্যোৎ সিং সিধু

খেলোয়াড়ই তরুণ। আমরা আশা করবো তাঁরা বিশ্বকাপের খেলায় জান-প্রাণ দিয়ে লড়বেন। তবে বিশ্বকাপের জন্যে ভারত কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় পরে পাঠাবে। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাঁরা গেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে বাদ পড়বেন কয়েকজন। তাই মনে হয় নব উদ্যমে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি ভারতকে বিশ্বকাপের কালো ঘোড়া বলে চিহ্নিত করেছেন। দেখা যাক ডেনিস লিলির কথা শেষ পর্যন্ত খাটে কিনা!

আবার আমরা বরং ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪৫টি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে ৮ বার। হেরেছে ২০টি টেস্টে। ১৬টি টেস্টের কোনো মীমাংসা হয়নি। বাকি একটি টেস্ট শেষ হয়েছিলো টাই হয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩১ জন ভারতীয় খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ৪৫ জন খেলোয়াড়।

দু দেশের মধ্যে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের হিসেব হলো–
ভারত: ৪ উইঃ ৬০০ (ডিঃ)–সিডনিতে–১৯৮৫ সালে।
অস্ট্রেলিয়া: ৬৭৪ রান–এডিলেড–১৯৪৭ সালে।
এক ইনিংসে সব থেকে কম রানের হিসেব হলো–
ভারত: ৫৮–প্রথম টেস্ট–ব্রিসবেন–১৯৪৭ সালে।
অস্ট্রেলিয়া: ৮৩–তৃতীয় টেস্ট–মেলবোর্ন–১৯৮০ সালে।

ভারতের পক্ষে এক মরশুমে ব্যক্তিগত ভাবে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন জি. আর. বিশ্বনাথ। ৫১৪ রান। ইনিংস প্রতি গড় রান ৭৪.০০। ১৯৭৯ সালে। আর অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ডন ব্রাডম্যান। ডন করেছিলেন ৭১৫ রান। ইনিংস প্রতি গড় রান দাঁড়িয়েছিলো ১৭৮.৭৫। ব্রাডম্যান এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট মরশুমের প্রথম বছরেই।

এক মরশুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট দখলের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ভারতের পক্ষে বিষেণ সিং বেদী। তিনি ৩১টি উইকেট দখল করেছিলেন উইকেট প্রতি ২৩.৮৭ রান দিয়ে। ১৯৭৭ সালে ৫টি টেস্ট খেলে বেদি এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই কৃতিত্ব এলান ডেভিডসনের। তিনি ১৯৫৯ সালে ৫টি টেস্ট খেলে ২৯টি উইকেট দখল করেছিলেন উইকেট প্রতি ১৫.১৭ রান দিয়ে। ঐ বছর রিচি বেনোও ২৯টি উইকেট পেয়েছিলেন উইকেট প্রতি ১৯.৫৮ রান দিয়ে। একটি টেস্টে দু দেশের বোলারদের মধ্যে সব থেকে বেশি উইকেট দখল করেছেন জেসু প্যাটেল। ১৯৫৯ সালে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ১৪টি উইকেট পেয়েছিলেন ১২৪ রানের বিনিময়ে। সেইবারই অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান ডেভিডসন ১২৪ রান দিয়ে ১২টি উইকেট পেয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে কানপুরের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জি. ডাইমক ১৬৬ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ১২টি উইকেট। দু দেশের বোলারদের মধ্যে এক ইনিংসে সব

কিরণ মোরে

চেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন ভারতের জেসু প্যাটেল। ১৯৫৯ সালে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে প্যাটেল ৬০ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৯টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সব থেকে বেশি ৭টি করে উইকেট পেয়েছেন ছজন বোলার। রে লিন্ডওয়াল ৩৮ রানে ৭টি উইকেট পান ১৯৪৭ সালে এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে। তারপর এই কৃতিত্ব অর্জন করেন রিচি বেনো। তিনি ৭২ রানে ৭টি উইকেট পান ১৯৫৬ সালে মদ্রাজের প্রথম টেস্টে। ঐ বছর ঐ টেস্টেই লিন্ডওয়াল আবার ৭টি উইকেট পান মাত্র ৪৩ রানের বিনিময়ে। ১৯৫৯ সালে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে অ্যালান ডেভিডসন ৯৩ রান দিয়ে ৭টি উইকেট পান। ১৯৬৭ সালে মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৬৬ রানে ৭টি উইকেট পান। আর ১৯৭৯ সালে কানপুরের তৃতীয় টেস্টে ডাইমক ৭টি উইকেট দখল করেন ৬০ রান দিয়ে।

নিচে ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলার সূচি দেওয়া হলো :

১৫-১৮ নভেম্বর–পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের খেলা
২১ নভেম্বর–নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে (একদিনের)
২৩-২৬ নভেম্বর–নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে
২৯ নভেম্বর-৩ ডিসেম্বর–প্রথম টেস্ট–ব্রিসবেনে
৬ ডিসেম্বর–বেনসন-হেজেস কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পার্থে (দিন-রাত্রি খেলা)
৮ ডিসেম্বর–বেনসন-হেজেস কাপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পার্থে
১০ ডিসেম্বর–বেনসন-হেজেস কাপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হোবার্টে
১৪ ডিসেম্বর–বেনসন-হেজেস কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে এডিলেডে
১৫ ডিসেম্বর–বেনসন-হেজেস কাপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এডিলেডে
১৭ ডিসেম্বর– প্রধানমন্ত্রী একাদশের সঙ্গে ক্যানবেরায়

২০-২৩ ডিসেম্বর–কুইনসল্যান্ডের সঙ্গে–কুইন্সল্যান্ডে
২৬-৩০ ডিসেম্বর–দ্বিতীয় টেস্ট–মেলবোর্নে
২-৬ জানুয়ারি–তৃতীয় টেস্ট সিডনিতে
১১ জানুয়ারি–বেনসন-হেজেস কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ব্রিসবেনে
১৪ জানুয়ারি–বেনসন-হেজেস কাপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিডনিতে (দিন-রাতের খেলা)
১৬ জানুয়ারি–বেনসন-হেজেস কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে মেলবোর্নে (দিন-রাতের খেলা)
১৮ জানুয়ারি–বেনসন-হেজেস কাপের প্রথম ফাইনাল মেলবোর্নে (দিন-রাতের খেলা)
২০ জানুয়ারি–বেনসন-হেজেস কাপের দ্বিতীয় ফাইনাল সিডনিতে (দিন-রাতের খেলা)
২২ জানুয়ারি–বেনসন-হেজেস কাপের তৃতীয় ফাইনাল সিডনিতে (দিন-রাতের খেলা)
২৫-২৯ জানুয়ারি–চতুর্থ টেস্ট–এডিলেডে
১-৫ ফেব্রুয়ারি–পঞ্চম টেস্ট–পার্থে

টাইমলেস টেস্ট

হেডিং দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছো। তা অবাক হবারই কথা। সত্যিই কিন্তু একবার একটা টাইমলেস টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসেছিলো। খেলাটি হয়েছিলো ইংলন্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার। ঠিক হয়েছিলো, সময়ের সীমায় খেলাটিকে বেঁধে রাখা হবে না। হারজিতের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে। খেলাটি আরম্ভ হয়েছিলো ডারবানে ১৯৩৯ সালের ৩ মার্চ। দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিলো ৫৩০ আর ৪৮১ রান আর ইংলন্ড ৩১৬ আর ৫ উইকেটে ৬৫৪। ইংলন্ডের দুর্ভাগ্য তারা একটুর জন্যে জিততে পারেনি। মাত্র ৪২ রান করলে ইংলন্ড জিতবে এইরকম যখন অবস্থা তখন বৃষ্টি এসে খেলা বন্ধ করে দিলো। শুধু কি তাই কেপটাউন থেকে ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের জাহাজ ১৬ তারিখে ছেড়ে যাচ্ছে। ডারবান থেকে কেপটাউন ট্রেনে যেতে পাক্কা দু দিন লাগবে। তাই ১৪ মার্চ বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের ছুটতে হলো ট্রেন ধরার জন্যে। কারণ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে হবে করছে। দেশে ফেরার জাহাজ আর হয়তো পাওয়া যাবে না। তাই টাইমলেস টেস্টেরও নিষ্পত্তি হলো না। কিন্তু লংগেস্ট টেস্ট আর হাইয়েস্ট এগ্রিগেট স্কোর হিসেবে সেই টেস্টটি স্মরণীয় হয়ে রইলো। এগারো দিনের সেই খেলাটিতে দু দল মোট ১৯৮১ রান করেছিলো। খেলা হয়েছিলো ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩ ও ১৪ মার্চ (৫ আর ১২ তারিখ ছিলো বিশ্রামের দিন। ১১ তারিখে খেলা হতে পারেনি বৃষ্টির জন্যে।) সেই ম্যাচটিতে মোট খেলা হয়েছিলো ৪৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট।

দক্ষিণ আফ্রিকা তো আবার টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসছে। ভারতের সঙ্গেও খেলবে। তাই ওদের সম্বন্ধে নানা রকম খবর-টবর এখন থেকেই জেনে রাখা দরকার। তাই না?

খবর-টবর

টানাটানি

আর্জেন্টিনার ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে টানাটানি চলছে অনেকদিন ধরেই। এখন যা অবস্থা তাতে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের একজনও বাকি থাকবেন কিনা সন্দেহ। এবারের কোপা আমেরিকা কাপে আর্জেন্টিনা যখন খেলতে গিয়েছিলো তখন তাদের তিনজন খেলোয়াড়ের পকেটে ইউরোপীয় ক্লাবগুলিতে খেলার চুক্তিপত্র ছিলো। অবশ্য ব্যাপারটা কেউ জানতো না। এই তিনজন হলেন ক্লডিও ক্যানিজিয়া, দিয়েগো সিমিয়োন আর দিয়েগো লাটোরি। ঐ প্রতিযোগিতায় কলম্বিয়াকে ২-১ গোলে হারাবার পরই গোলরক্ষক ইতালির বিশ্বকাপের হিরো সার্গিও গায়কোচিয়াকে টেনে নিলো ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিভাগের দল ব্রেস্ট। দক্ষিণ আমেরিকার নয়া আবিষ্কার স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল ব্যাটিসটুটাকে সই করালো ফ্লোরেনটিনা। লাটোরিও আছেন ঐ ক্লাবে। গ্যাব্রিয়েল কোপা আমেরিকা কাপে ছ'গোল দিয়ে শীর্ষ গোলদাতা হয়েছেন। ব্রাজিলকে ৩-২ গোলে হারানোর নায়ক ছিলেন ডারিও ফ্রাঙ্কো। তাঁকে দলে টেনে নিয়েছে স্পেনের জারাগোজা। মাঝমাঠের খেলোয়াড় লিওনারডো অ্যাসট্রাডা গেলেন স্পেনের সানটানডার ক্লাবে। রক্ষণ ভাগের সার্গিও ভাজকুইজ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন স্পেনের সেভিলার সঙ্গে। মিডফিল্ডার লিওনাডো রডরিগউজকে নিয়ে টানাটানি করেছিলো চিলির কোলো কোলো আর স্পেনের টেনিরিফ ক্লাব। কিন্তু তিনি ওদের পাত্তা না দিয়ে মার্সেলিসেই রয়ে গেছেন। বাদ যাননি অতিরিক্ত গোলরক্ষক আলেজানড্রো লানারিও। আর কাউকে না পেয়ে তাঁকেই টেনে নিয়ে গেলো মেক্সিকো সিটির উনাম ক্লাব।

বাজার দর

বিজ্ঞাপনের বাজারে ক্রিকেটারদের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকারের দরই বোধহয় সব থেকে বেশি। তাঁকে নিয়ে টানাটানির অন্ত নেই। সম্প্রতি একটা বিজ্ঞাপনের শূটিংয়ের সময় মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদের একটা বিজ্ঞাপনের শূটিং চলছিলো। শচীন সুন্দর সব জামা-প্যান্ট পরে পোজ দিয়ে দাঁড়ালেন। ঝটপট ক্যামেরা চালু হয়ে গেলো। বিভিন্ন পোজে শচীনের ছবি উঠলো।

এরপর ফটোগ্রাফার বললেন, শচীন এবার তুমি জামা-প্যান্ট খুলে টারজানের মতো পোজ দিয়ে দাঁড়াও।

শচীন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ওটি হচ্ছে না।

কেন কি হয়েছে ?

আমায় দিয়ে ও সব হবে না। শচীনের সাফ জবাব।

ফটোগ্রাফার বললেন, কেন ইমরান তো ঐভাবে পোজ দিয়ে ছবি তুলতে দিয়েছেন এই বিজ্ঞাপনের জন্যে।

শচীন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,

ভুলে যাচ্ছো কেন–আমি ইমরান নই, আমি শচীন তেন্ডুলকার।

ব্যবসা-বাণিজ্য

মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হলো না। পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরান খান নভেম্বর মাসে ৩৯ বছরে পা দিয়েছেন। এখনো চুটিয়ে খেললেও ইমরান পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, এবার তাঁকে সরে যেতে হবে। আর বেশি দিন তিনি ক্রিকেট মাঠে দাপিয়ে বেড়াতে পারবেন না। ক্রিকেটের কল্যাণে টাকাকড়ি তাঁর কম নেই। কিন্তু খেলা ছাড়ার পর ভবিষ্যতে যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তাই ইমরান এখন একটু তৎপর হয়ে উঠেছেন। এখন আর শুধু ইউনিসেফ কিংবা তাঁর ক্যানসার হাসপাতালের জন্যে টাকা তুলেই তিনি চুপ করে থাকছেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন দিয়েছেন। সম্প্রতি লন্ডনের সোয়ানক কভেন্ট গার্ডেনে একটা রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে। সেখানকার ব্যাপার-স্যাপার সব চোখ ধাঁধানো। সেই রেস্তোরাঁয় ইমরান অনেক টাকা দিয়েছেন। তাঁর পার্টনার বৃটিশ ক্যাবিনেট মিনিস্টারের ছেলে ক্রিস্টোফার গিলমোর। গিলমোর ইমরানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইমরানদের রেস্তোরাঁয় মার্কিন খাবার-দাবারই শুধু পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি হাই সোসাইটির। তাই রেস্তোরাঁটা নাকি চলছেও খুব।

১। ১৯৮৫ সালে উইম্বলডনে পুরুষ ও বালক বিভাগের চ্যাম্পিয়নকে নিয়ে একটা অদ্ভূত ব্যাপার ঘটেছিলো। সেটা কি?

২। ১৯৯২ সালের বার্সিলোনা ওলিম্পিকের ম্যাসকট কি?

৩। ইতালিয়া ৯০-এর সময় একটি দেশের ভোট হয়েছিলো। বিশ্বকাপে খেলতে আসার জন্যে সেই দেশের খেলোয়াড়রা ভোট দিতে পারেননি। কোন দেশ সেটি?

৪। Chucked Around বইটি কার লেখা?

৫। ১৯৮৪ সালের ওলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন অ্যাথলিট অন্য দেশের হয়ে ট্র্যাকে নেমেছিলেন। তাঁর নাম কি? কোন দেশের হয়ে তিনি নেমেছিলেন?

৬। উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা কোন সালে টি. ভি-তে প্রথম সরাসরি দেখানো হয়?

৭। শচীন তেন্ডুলকারের ডাকনাম কি?

৮। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সব থেকে কম বয়সে ১০০০ ও ২০০০ রান করার রেকর্ড কার, কতো বয়সে?

উত্তর ঃ

১। সেবার উইম্বলডনে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বরিস বেকার। তাঁর বয়েস তখন ১৭ বছর ২২৪ দিন। আর বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন লিওনার্ডো লেভিলি। তাঁর বয়েস তখন ১৮ বছর ৩০ দিন। অর্থাৎ পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়নের থেকে বালক বিভাগের চ্যাম্পিয়ন বয়েসে বড়।

২। কল্পনায় আঁকা কুকুর। তার নাম কোনি।

৩। চেকোশ্লোভাকিয়া।

৪। ক্যারিবিয়ান ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথের।

৫। জোলা বাড। ইংলন্ডের হয়ে।

৬। ১৯৩৭ সালে।

৭। তেন্ডলি, সাচ্চু।

৮। শচীন তেন্ডুলকারের। ১০০০ রান করেন ১৬ বছর ২৭৪ দিনের মাথায় আর ২০০০ রান করেন ১৭ বছর ১২৩ দিনের দিন।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

চন্দন দেবনাথ (বাঘা যতীন প্লেস, কলকাতা–৮৯)

প্রশ্ন ঃ জি. আর বিশ্বনাথের ব্যাটিংয়ের গড় হিসেব জানতে চাই।

বিশ্বনাথের অ্যাভারেজ

৯১ টেস্ট–১৫৫ ইনিংস–১০ নঃ আঃ–৬০৮০ রান–২২২ সর্বোচ্চ–৪১.৯৩ গড়–১৪ সেঞ্চুরি–৬২টি ক্যাচ–৭০টি বল করেছেন–৪৬ রান দিয়েছেন–১টি উইকেট পেয়েছেন।

রবীন্দ্র আগরওয়াল (সুভাষ রোড, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন ঃ কোন খেলায় সব থেকে বেশি টাকা?

উত্তর ঃ প্রথম মোটর রেসিং, তারপর বক্সিং (বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াই) আর তারপর টেনিস।

পায়েল দত্ত (প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া)

উত্তর ঃ তোমার চিঠিটা বড্ড দেরি করে আমাদের কাছে এসেছে যে! তখন সব হয়ে গিয়েছিলো। তাই....

বান্টু ঘোষ (বর্ধমান)

উত্তর ঃ শুকতারার ঠিকানা তো জানো। চটপট পাঠিয়ে দাও কেমন!

চিরদীপ দত্ত (২৪ পরগনা–পুরো ঠিকানা নেই)

উত্তর ঃ রাগ কোর না। অজস্র চিঠি, ছবি ইত্যাদি আসে তাই তো উত্তর দিতে দেরি হয়ে যায় ভাই!

জানো কী

- ☐ ধরা পড়ে যাবে কি ম্যাম'জেল? কি হবে পাইলটের?
- ☐ চড়কডাঙার নান্টুমামা আমেরিকায় গিয়ে পাকড়াও হলেন রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে। তাঁকে দেখে তারা চিৎকার করে উঠলো–রেন গড.... রেন গড....তারপর কি হলো?
- ☐ ছোট্ট ফার গাছের স্বপ্ন ছিলো বড়দিনের উৎসবে যাবার, জাহাজে চড়ার, ছোটদের আনন্দে মেতে ওঠার–এক দিন তার স্বপ্ন সার্থক হলো, কিন্তু তারপর কি হলো?
- ☐ বোসদের পোড়ো আমবাগানে আম পেড়ে খাওয়ার দফারফা হয়ে গেলো হঠাৎ। কিন্তু কেন?
- ☐ রাত ফুরোলেই শিবির গোটানোর কথা পালরাজ মহীপালের। কিন্তু শিবির উঠলো না। উল্টে....কি হলো সেই গ্রামে।

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে **শুকতারার পৌষ সংখ্যায়**। সেই সঙ্গে চমকে যাবার মতো আরও অনেক কিছু।

উক্তি

আমি ৩৫-৪০ বছরের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে কোর্টে নামি না। সেরকম কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। ভালোবাসি বলেই আমি খেলছি।

–জিমি কোনর্স

(মার্কিন মুক্ত টেনিসের সেমিফাইনালে হেরে যাবার পর)

বিশ্বকাপে ভালো কিছু করার জন্যে ভারতের দরকার ক'জন ভালো বোলার। ভারতে নিপুণ বোলারের অভাব নেই। দরকার শুধু খুঁজে বের করার। সেই চেষ্টাই চলছে।

–মাধব রাও সিন্ধিয়া

(ভারতীয় ক্রিকেট দল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

চার বছর আগে আমার স্বপ্ন ছিলো জিমি কোনর্স আর জন ম্যাকেনরোর সঙ্গে খেলা–যাতে ভবিষ্যতে আমার নাতি-নাতনিদের বলতে পারি আমিও ওঁদের সঙ্গে খেলেছি।

–জিম কুরিয়ার

(এবার মার্কিন মুক্ত টেনিসে জিমি কোনর্সের সঙ্গে খেলার পর)

আমার মতো খেলোয়াড়দের নামে যেসব গুজব-টুজব ছড়ায় তার জন্যে দায়ী কিন্তু সাংবাদিকরা। খেলা ছেড়ে ওঁরা আজকাল গল্পের পেছনেই বেশি ঘোরেন। তাই তো এই অবস্থা।

–পল গ্যাসকোয়েন

(নিজের অপারেশন, খেলা ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে)

বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া সফরের চাপটা আমাদের খেলোয়াড়দের ওপর একটু বেশি করেই পড়বে। জানি না এতে আমাদের পারফরমেন্সের কোনো ক্ষতি হবে কিনা!

–কপিলদেব

(বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে)

আমি গ্রামের মেয়ে। ও সব ডোপ-টোপের ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না। তবে সাফল্য আমার অনেক শত্রু তৈরি করেছে। তারাই আমার কেরিয়ারটা শেষ করে দিলো। ওদের জন্যে একরাশ অপবাদ আমার মাথায় চাপলো। বিশ্বাস করুন শক্তি বাড়াবার জন্যে কোনো ওষুধ-টষুধ আমি কোনোদিনই খাইনি। যেটুকু ভার তুলতে পারি তা নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছি। যে কোনোদিন, যে কোনো জায়গায় সেই ভার তুলে আমি দেখিয়েও দিতে পারি।

–সুমিতা লাহা

(ডোপ টেস্টে পজিটিভ হবার খবর আসার পর)

এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আমার মনে হয় ভারতই কালো ঘোড়া।

–ডেনিস লিলি

(সম্প্রতি ভারতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়)

নিচের সারির খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি কথাই বলি না।

–মণিকা সেলেস

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

পড়ার সঙ্গে খেলা

বীরু বসু

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

শিক্ষার প্রধান অঙ্গই খেলা। একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু অধিকাংশ অভিভাবকরাই এ কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ভাবেন লেখাপড়ায় ভালো হতে গেলে খেলাধূলা ছাড়তে হবে। দুটো একসঙ্গে করতে গেলে কোনোটাতেই সাফল্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু তোমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা 'পড়ার সঙ্গে খেলা' পড়ে এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী যেমনি পড়াশুনায় তেমনি খেলাধূলায় সমান পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। উভয়ক্ষেত্রেই তাদের কৃতিত্ব তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে। 'এমনই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুগলী জেলার মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। ১৯৫২ সালে স্বামী প্রেমঘনানন্দ (অরূপ) মহারাজ অল্প কিছু ছাত্র এবং শিক্ষককে নিয়ে আশ্রমটি স্থাপন করেন। সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতাকে সম্বল করে উনচল্লিশ বছর ধরে আশ্রমটি তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এটির দায়িত্বভার বহন করছেন স্বামী সোমানন্দ মহারাজ। আশ্রমিকদের প্রত্যেককেই কঠোর নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলতে হয়। মোট ত্রিশ জন শিক্ষক নার্সারি বিভাগ থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া এবং খেলাধূলা উভয় বিভাগই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের উৎসাহেই ছাত্ররা সংগীত, আবৃত্তি, নাটক, ডিবেট, অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়েও উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করতে পারছে।

অতীতে-এই আশ্রমের বেশ কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল ও জিমন্যাস্টিক্সে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। প্রাক্তনদের মধ্যে শ্যাম কর্মকার, পূর্ণেন্দু ঘোষ, প্রদীপকুমার দে, ব্রজকিশোর লাহিড়ী, আর্য বসুরায়, অতনু চ্যাটার্জী, জয়ন্ত কর্মকারদের নাম আশ্রমের খেলার পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এদের দক্ষতায় ১৯৬৩ থেকে ৬৫ পর্যন্ত টানা তিন বছর আশ্রমের ফুটবল দলটি সাব-ডিভিশান চ্যাম্পিয়ান হয়ে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেছিল। ১৯৬৬ থেকে ৬৭ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের এন. সি. সি. ট্রুপ হুগলী জেলায় তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের অধীনে জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ট্রুপ বিবেচিত হয়ে বেস্ট ট্রুপ ট্রফি অর্জন করে। ১৯৯০-তে গোষ্ঠ পাল স্মৃতি ফুটবলে জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়, ও রাজ্য পর্যায়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

আশ্রমটিতে মোট ছাত্রসংখ্যা বারশ'। গত বছর ১১২ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭০ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৩৯ জন উত্তীর্ণ হন। ৭০ জনের মধ্যে ২১ জন ছাত্র স্টার মার্কস পান। পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী আশ্রমটি হুগলী জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

সুশান্ত কর্মকার

অভিজিৎ মুখার্জী

সেরা ছাত্র সুমিত কর্মকার

চলতি মরশুমে আশ্রমের ছাত্ররা খেলাধূলায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। ফুটবলে সুশান্ত কর্মকার, অভিজিৎ মুখার্জী, অমরেশ গোস্বামী, অমর ব্যানার্জী, জগন্নাথ কর্মকার ও সুমিত কর্মকার এখন উল্লেখযোগ্য নাম। এদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে আশ্রম কর্তৃপক্ষের এবং গেমস টিচার জহরলাল কর্মকারের নিরলস পরিশ্রম। জহরবাবু জানালেন, খেলাধূলার প্রতি যদি কর্তৃপক্ষ আর একটু বেশি নজর রাখেন তবে হলফ করে বলতে পারি এখান থেকে অনেক খেলোয়াড় তৈরি হবে।

আশ্রমের সেরা ছাত্রটির নাম সুমিত কর্মকার। পরীক্ষার খাতায় সুমিতের নম্বর সহপাঠীদের রীতিমতন ভাবিয়ে তোলে। আবার সেই সঙ্গে গোষ্ঠ পাল স্মৃতি ফুটবলে ছোটখাটো এই কিশোরটি রীতিমত লড়াই করেই সকলের বাহবা আদায় করে নিয়েছে। সুমিতের কাছে আদর্শ ফুটবলার ওর জেঠু অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীর কর্মকার।

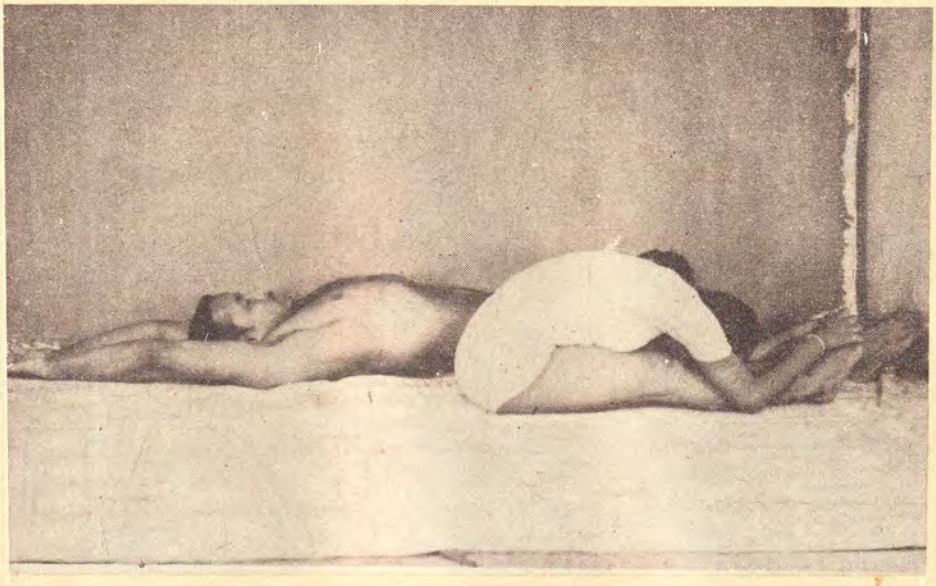

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম // তুষার শীল

সিট আপস্ বা পশ্চিমোত্তানাসন

শরীরের সৌন্দর্য অনেকাংশেই নির্ভর করে পেটের গড়নের উপর। শরীরের মধ্যভাগ মেদবহুল হলে দেখতে খারাপ লাগে। তার সঙ্গে নানান ব্যাধিও প্রবেশ করবে আমাদের শরীরে। এখানে একটা পেটের ব্যায়ামের কথা লিখছি, যেটা করলে পেটের মেদ কমবে, শরীরের নানান অসুখও সারবে। ব্যায়ামটি অনেকাংশে যোগ ব্যায়ামের কাছে ঋণী।

দু-পা জোড়া করে সোজা টান টান রেখে শুয়ে পড়ো। দু'হাত মাথার উপর কান বরাবর তুলে দাও ছবির ছেলেটির মতো। এইবার প্রথমে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপর অংশকে তুলে নিয়ে এস, সামনের মেয়েটির অবস্থানে। দু'হাত দিয়ে দু-পায়ের বুড়ো আঙুল ধরবার চেষ্টা করো। পারলে কনুইদ্বয় মাটিতে লাগিও। লক্ষ্য রেখ হাঁটু যেন ভাঁজ হয়ে না যায়। তবে প্রথম প্রথম হাঁটু ভাঁজ করেই অভ্যাস করো। পরে কিন্তু পা সোজা টানটান রেখে করো। কপাল হাঁটুতে এবং পেট উরুদ্বয়ে লাগবে। তৎক্ষণাৎ শ্বাস নিতে নিতে ফেরৎ যাও ছেলেটির অবস্থানে। প্রতি ক্ষেপে ৮/১০ বার করে দু-তিন ক্ষেপ অভ্যাস করো। যাদের এইভাবে করতে অসুবিধা হবে তারা মেয়েটির অবস্থানে এসে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১০।১৫ সেকেন্ড থাক। পরে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও। এইভাবে দু-তিন ক্ষেপ অভ্যাস করো। এটি পশ্চিমোত্তানাসন হলো।

উপকারিতা–আমাদের শিরদাঁড়াকে মজবুত হতে এই আসন খুবই সাহায্য করে, বিশেষ করে শিরদাঁড়ার সামনের দিকের পেশী ও স্নায়ুগুলিকে খুবই পুষ্ট হতে সাহায্য করে। আমাদের সকলের জেনে রাখা উচিত শিরদাঁড়া টুকরো টুকরো হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, দুটি হাড়ের মাঝে রয়েছে আন্ত-কশেরুকা চাকতি বা DISC। এটি এদের পক্ষে খুব ভাল ব্যায়াম। শিরদাঁড়া যার যত নরম ও কমনীয় থাকবে, শিরদাঁড়ার রোগ তত কম হবে। যৌবনকেও মানুষ ধরে রাখতে পারবে দীর্ঘদিন ধরে। তাই শিরদাঁড়াকে সামনে, পিছনে বা পাশে বেঁকিয়ে ব্যায়াম করানো হয়। আসনটি অম্ন্যাশয় গ্রন্থিকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখে, যার ফলে বহুমূত্র বা ওই জাতীয় অনেক রোগ হয় না। আর বহুমূত্র রোগীরা নিয়মিত এই আসনটি করলে, রোগের মাত্রা অনেক কম থাকবে। এ ছাড়াও আমাদের শরীরের বিশেষ করে পেটের যন্ত্রপাতিসমূহ সহজেই বেগড়াতে পারবে না অর্থাৎ যকৃৎ, প্লীহা, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র প্রভৃতিকে সক্রিয় ও সবল রাখবে। যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগকেও আমরা শরীর থেকে বহুদূরে রাখতে পারব। যারা ইতিমধ্যেই এই সবের শিকার হয়েছে তারাও নিষ্কৃতি পাবে যদি নিয়মিত অন্য কয়েকটি ব্যায়ামের সঙ্গে এই ব্যায়ামটি করো। আর সেই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একটু সচেতন থেকো। বিশেষ করে মিষ্টি ও অত্যধিক ভাজাভুজি খাবার থেকে দূরে থেকো। তোমাদের ভিতর যাদের কোমরের ব্যথা, পেটে আলসার, এপেন্ডিসাইটিস প্রভৃতি রয়েছে তারা এই আসনটি করতে যেও না।

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

টারজান মহীয়ান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উইলিয়াম সিসিল ক্লেটন ইংরেজীতে কথা কইছে টারজানের সঙ্গে। তার প্রাণরক্ষার জন্য যে অসাধারণ সাহস আর শৌর্যের পরিচয় টারজান দিয়েছে, তারই জন্য ধন্যবাদ দিয়ে। কিন্তু যত কথাই ক্লেটন বলুক, তার উত্তরে ঐ অত্যাশ্চর্য যুবার দিক থেকে সে পাচ্ছে শুধু একজোড়া ডাগর চোখের অর্থহীন অপলক দৃষ্টি। আর মাঝে মাঝে স্ফীতোন্নত দুটো কাঁধের অনিচ্ছাকৃত ঝাঁকুনি। ক্লেটন বুঝতে পারছে না সে ঝাঁকুনির মানে কি? ও কি বলতে চাইছে যে ওর শৌর্য সাহস এমন কিছু অসাধারণ নয়? না কি বোঝাতে চাইছে যে সে ক্লেটনের ভাষা জানে না?

তীরধনু তূণীর এইবার পিঠের যথাস্থানে জমা পড়েছে। এবার বুনো লোকটা (ক্লেটনের মতো আমরাও তো তাকে বুনো বলে ভাবতে পারি!) আবার তার ছোরা বার করল। আর সদ্যনিহত ন্যুমার দেহ থেকে বড় বড় কয়েক দাগা মাংস কেটে নিয়ে পরম পরিতোষে ভোজনে লেগে গেল। ভদ্রতার অভাব নেই, ক্লেটনকেও সেই কাঁচা মাংসের ভোজে যোগ দেবার জন্য সে ডেকেছিল। আমন্ত্রণটা যদিও ভাষার মাধ্যমে হয়নি, তবু তার মর্ম অনুধাবনে অসুবিধা বোধ করেনি ক্লেটন। সে কাঁচুমাচু হয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল, আরে ছিঃ, কাঁচা মাংস খাবে কী? সে কি পশু? না, রাক্ষস?

বুনোটা ওদিকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে সেই মাংস। ক্লেটন যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখে যাচ্ছে তার ভোজনোৎসব, তাতে যুগপৎ মেশানো আছে বিস্ময়, ভয়, জিজ্ঞাসা, এবং নির্ভরযোগ্য অনুমান।

অনুমানটা কী? অনুমানটা এই যে এই আমমাংসভোজী বুনোটাই বুঝি হবে সেই "মহাকপিলালিত টারজান" যার ছাপার হরফের লেখন কেবিনের দরোজায় তারা লটকানো দেখেছিল।

তা যদি হয়, এই বুনোই যদি হয় টারজান, তবে তো সে অবশ্যই ইংরেজী জানে! না জানলে কখনো লেখা যায়? দেখা যাক, আবার চেষ্টা করে ওকে দিয়ে কথা বলানো যায় কিনা!

পারল! ভাষা একরকম, বুনোর মুখ থেকে না-বার করে ছাড়ল না ক্লেটন। কিন্তু হায়! এর নাম ভাষা নাকি? এ তো বানরের কিচিরমিচির! সেই কিচিরমিচিরের সঙ্গে মেশানো অবশ্য খানিকটা করে হিংস্র শ্বাপদের ধমক চমক। নাঃ, এ-লোক হতেই পারে না টারজান, এ ইংরেজী শেখেনি জীবনে।

খাওয়া শেষ করে বুনোটা এইবারে উঠে পড়ল, আর ক্লেটনকে ইশারা করল তার অনুসরণ করতে। ক্লেটন তো হতবুদ্ধি। এ-বুন্যে তাকে যেদিকে যেতে বলছে, সেটা যে একেবারে উল্টো দিক! অর্থাৎ ক্লেটন আগে যেদিকে যাওয়ার

চেষ্টা করছিল, তারই উল্‌টো!

ক্লেটন স্বভাবতই ইতস্তত করছে এই বুনোর সঙ্গে যেতে। উল্‌টো পথে ও তাকে কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে, ঠিক কি? কিন্তু বুনোটা সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। ক্লেটন তার সঙ্গে যেতে দ্বিধা করছে, এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে ক্লেটনের কোট ধরে জোর করেই নিজের পছন্দমত পথে টেনে নিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়ে তারপর অবশ্য সে ক্লেটনকে ছেড়েও দিল। এবার আর ক্লেটন আপত্তি করছে না সঙ্গে যেতে। আপত্তি করলে তো ছাড়বেও না বুনো! কার্যত সে তো এখন বুনোর হাতে বন্দী।

অতি মন্থর চরণেই চলছে তারা। আরণ্য নিশার কালো ওড়নায় ঢাকা পড়ে আসছে চারদিক। শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের আভাস ভেসে আসে সেই ওড়নার তলা থেকে। অকস্মাৎ একটা অতি ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল ক্লেটনের কানে। আওয়াজটা রাইফেলের। রাইফেল গর্জে উঠল। মাত্র একটিবার। তারপর আবার স্তব্ধতা!

ওদিকে, সৈকতের উপরে সেই কেবিনে দুটি নারী ভয়ে কাঁপছে তখন। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পরস্পরকে তারা জড়িয়ে ধরছে সাহসের প্রত্যাশায়। বয়োজ্যেষ্ঠাটি নিগ্রো, অন্যটি মার্কিন তরুণী। এমেরাল্‌ডা আর জেন। ধাত্রী এবং আশৈশব স্নেহের পাত্রী।

এমেরাল্‌ডা কেঁদেই ভাসিয়ে দিচ্ছে। মেরিল্যান্ড থেকে কী কুক্ষণে যে যাত্রা করেছিলাম এই অপয়া দেশের উদ্দেশে! শ্বেতাঙ্গিনী তরুণীটি কাঁদছে না অবশ্য, কিন্তু দুশ্চিন্তার আতঙ্কে সেও অধীর।

আর ঠিক তখনই একটা মড়মড় শব্দ ওরা শুনতে পেল কেবিনের ভিতরে বসে। একটা অতিকায় জন্তু যেন কেবিনের বহু পুরোনো কাঠের বেড়ায় সারা দেহের শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকতে চাইছে যেন।

মাত্র দুই ফুট ব্যবধান ঐ শ্বাপদ আগন্তুকে আর এই ভীতা-ত্রস্তা রমণী দুটিতে। মাত্র দুই ফুট, তবে তারই মধ্যে ঐ জীর্ণ, পল্‌কা কাঠের দেয়ালটা আছে বটে।

'চুপ, এমেরাল্‌ডা, চুপ'—ফিসফিস করছে জেন। ওধারের জীবটাকে এধারের কান্না যেন আরও বেশি করে আকর্ষণ করছে।

দরোজায় ধীরে ধীরে আঁচড়াচ্ছে কিসে যেন। একটু বাদেই থেমে গেল সে-শব্দ, জন্তুটা যেন কেবিন বেড় দিয়ে পিছনের জানালায় হাজির হয়েছে, দুটি স্ত্রীলোকের বিস্ফারিত চক্ষু ভিতর দিকে সেই জানালার উপরেই নিবদ্ধ। কারণ, ছোট্ট জানালার ছোট্ট কাচখণ্ডের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক সিংহিনীর প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল।

সিংহী। স্যাবর যার নাম আরণ্য জীবদের ভাষায়।

স্যাবরের জ্বলন্ত দৃষ্টি ঠিক ওদেরই উপরে।

জেন ফিসফিস করছে, 'দ্যাখ, দ্যাখ এমেরাল্‌ডা! জানালাটা দ্যাখ। শীগগিরি! জানালাটা!'

জানালায় ছোট্ট একটু চতুষ্কোণের উপরে চাঁদের আলো। এমেরাল্‌ডার দুটি চক্ষুর দৃষ্টিও তারই উপরে। একটা নিচুগলার হিংস্র গর্জন সেই চতুষ্কোণের ওপিঠ থেকে। এমন ভয়াল দৃশ্য বেচারী নিগ্রো প্রৌঢ়ার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সে শুধু একবার সকাতরে কেঁদে উঠল—'ও গ্যাবারেল!'—তারপরই প্রায় হতজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল মেজেতে।

সে যেন কত, কত দীর্ঘ সময়। মহাসিংহিনী জানালার গোবরাটের উপরে সেই যে সামনের দুই পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে-পা আর নামছে না তার। পা-ও নামছে না, তার আগুন চোখের চাউনিও এক মুহূর্তের জন্য সে ঘোরাচ্ছে না অন্য দিকে। এইবার তার মস্ত মস্ত নখর দিয়ে সে জাফরি ধরে টানাটানি শুরু করল। জেন যেন দম আটকেই মারা পড়বে এইবার।

তবে খুব দয়া ভগবানের। ঐ যে স্যাবর জানালা ছেড়ে ওদিকে গেল।

কিন্তু না গো জেন পোর্টার, না। জানালা ছেড়ে গেল বলেই যে স্যাবর তোমাদের রেহাই দিয়ে গেল, কদাচ এমন ভেবো না। ঐ যে তার পায়ের শব্দ আবার দরোজাতে শোনা যায়। আবার সে আঁচড়াচ্ছে দরোজা। এবার আগের চেয়েও জোরে জোরে আঁচড়াচ্ছে। জন্তুটা যেন টেনেই ছিঁড়ে নামাবে দরোজার কাঠের পাল্লা। ঐ দরোজার ওধারেই তো তার দুই দুটো শিকার, দুই দুটো দুর্বলা রমণী।

একবার দরোজা আঁচড়াচ্ছে, আর একবার জানালায় এসে চাঁদের আলোতে দেখিয়ে যাচ্ছে নিজের মুখখানি। আন্দাজ কুড়ি মিনিট কাল পালটাপালটি এই খেল দেখাতে থাকল স্যাবর। আর মাঝে মাঝে ব্যর্থতাজনিত রোষের হুঙ্কার এক একটা।

অবশেষে সে অবলম্বন করল নতুন এক রণকৌশল। দরোজাও নয়, জানালাও নয়, এবার সে পড়ল জাফরি নিয়ে। পাহাড়সমান নিজের শরীরের সমস্ত ওজনটা চাপিয়ে দিল জাফরির পল্‌কা কাঠামোর উপরে।

জাফরির মাঝে মাঝে ফাঁক। কাজে কাজেই গাঁথুনি দুর্বল। স্যাবর তার বিশাল কলেবরের ভার সেই সব জায়গায় চাপিয়ে বিপুল বিক্রমে চাড় দিতে লাগল। ধীরে ধীরে বিস্তৃততর হতে থাকল সেই সংকীর্ণ ফাঁকগুলি, গোটা জাফরিটাই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা এইবার।

ভেঙে অবশ্য পড়ছে না এখনও, কিন্তু ফাঁকগুলো প্রশস্ততর হচ্ছে ক্রমশঃ। সিংহিনীর কৃশ, নমনীয় দেহ সেই ফাঁক দিয়ে অল্পে অল্পে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। জেন যেন ঘোরতর দুঃস্বপ্ন দেখছে একটা। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুই হাত বুকের উপরে কোণাকুণি বাঁধা। বিস্ফারিত দুই চক্ষু কী যেন বিভীষিকা দেখে নিথর চাহনি নিবদ্ধ করেছে সিংহিনীর ভ্রূকুটিভয়াল বদনমণ্ডলের উপরে। মাত্রই আর দশ-বারো ফুট দূরে ঐ সিংহিনী। সাবাশ এদেশের পৌরশাসনের ব্যবস্থা! এরকম

বিপজ্জনক জানোয়ারকেও এদেশে রাস্তায় ছেড়ে দেয় যদৃচ্ছ ভ্রমণের জন্য।

নিগ্রো রমণীর দেহটা পড়ে আছে জেন-এর পায়ের কাছে। ওকে যদি জাগানো যেত দুইজনে মিলে কোনো ফিকিরে সিংহিনীকে কেবিন থেকে হয়ত তাড়াতেও পারত।

জেন এমেরাল্‌ডার দেহটাকে জোরে জোরে নাড়া দিতে লাগল–'এমেরাল্‌ডা! এমেরাল্‌ডা। জাগো এক্ষুণি, আমার সঙ্গে হাত লাগাও। তা নইলে আমরা গেলাম।'

এমেরাল্‌ডা ধীরে ধীরে চোখ মেলছে, সমুখেই সিংহিনীর মুলোর মতো মস্ত দাঁতের পাটি। আর লোলজিহ্বা, তা দিয়ে লালা ঝরছে–আর–আর–

সে কী মর্মভেদী চীৎকার এমেরাল্‌ডার। চার হাত-পায়ে হামা দিতে দিতে সে ঘরখানার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেল। তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল–'ও গ্যাবারেল! ও গ্যাবারেল!'

স্যাবর তার ঘাড় গলা ইতিপূর্বেই ঢুকিয়ে দিয়েছে জাফরির ফাঁক দিয়ে। সেই ফাঁকের উপরে আর এক কিস্তি জুলুমবাজি করতে-না-করতেই ফাঁক আরও অনেক বেড়ে গেল, বলতে গেলে স্যাবরের অর্ধেকখানি দেহই এখন কেবিনে অনুপ্রবিষ্ট।

বাকী অর্ধেক? জাফরিতে আর কোনো বস্তু নেই। সিংহিনী আর একবার আড়মোড়া ভাঙলেই তার দেহের বাকীটা মসৃণভাবে ঢুকে পড়বে ভিতরে।

এই বিপৎকালে জেন-এর হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক অপরিচিত ব্যক্তির কথা, একবারই যার অস্তিত্বের প্রমাণ সে পেয়েছিল আজই অপরাহ্ণে। বল্লম ছুড়ে মেরেছিল ছুঁচোমুখো একটা বাঁটকুলের উদ্দেশে, জেন-এরই বন্ধু ক্লেটনের প্রাণরক্ষার জন্য।

মানুষের চিন্তাধারা কখন কোন খাতে বইবে, মুহূর্ত পূর্বেও কেউ তার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। ইতিপূর্বে এক চিঠি এসেছিল। তাতে ছাপার হরফে স্বাক্ষর ছিল টারজান, মহাকপিলালিত। সেই সূত্রেই বল্লম নিক্ষেপের দায়িত্ব বা কৃতিত্ব সবই সেই টারজানের উপরে আরোপ করে বসে আছে জেন। আর এখন?

বিপদের কালে রক্ষাকর্তা টারজান ছাড়া কেউ নেই আর। মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে দাগ কেটে বসে গিয়েছে কখন, নিজেই তা টের পায়নি জেন। টের পেল এইবার, আচমকাই টের পেল। আর প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারে জেন আর্তস্বরে আবেদন জানালো সেই অদৃশ্য রক্ষাকর্তার উদ্দেশে–'টারজান রক্ষা কর, টারজান রক্ষা কর।'

এই আবেদনের মধ্যে টারজানের নামটাই শুধু নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে টারজান। আর কিছু বোঝেনি। বোঝার দরকারও ছিল না। বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজন না হলে টারজানকে স্মরণ করবে কে আর?

এবং টারজান ছাড়া বিপদ থেকে উদ্ধার করবেই বা কে?

'টারজান আসছে'–একটা অপরিমেয় আশ্বাসের বাণী জাফরির ওধার থেকে শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত, উল্লসিত জেন এমেরাল্‌ডার অচেতন দেহটাকে নাড়া দিচ্ছে তখন–'ওঠো এমেরাল্‌ডা, ভয় নেই আর–'

একটা সমুচ্চ হুংকার, আর তার সঙ্গে দুখানা সোনার বর্ণ বাহু। বাহু দুখানা স্যাবরের দেহটাকে বাইরে থেকে টেনে ধরেছে, টেনে কেবিন থেকে বাইরে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সে চেষ্টাই বুঝি ঐ ফলবতীও হতে চলেছে।

টারজান ভাবছে, স্যাবরকে নিয়ে অতঃপর সে করবে কী! ভাঙা জাফরির সংকীর্ণ আবেষ্টনে যতক্ষণ সে বন্দী আছে, ততক্ষণ দেহটা ঘুরিয়ে আততায়ীকে আক্রমণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আততায়ীর আকর্ষণে সে-দেহ একবার যখন ফাঁকায় বেরুবে, তখন তাকে নিরস্ত করবে কে?

'ছোরা! ছোরা!'–চীৎকার করছে টারজান।

টারজানের কটিতে ছোরা আছে। সে ক্লেটনকে নির্দেশ দিচ্ছে, তার কটি থেকে সেই ছোরা টেনে নিয়ে সে স্যাবরকে দীর্ণবিদীর্ণ করে দিক।

কিন্তু ক্লেটন তা বুঝতে পারছে কই? আর বুঝতে পারেও যদি, সে-সাহস সে যে সঞ্চয় করতে পারবে, তারই বা আশা কই?

সমস্যার সমাধান করল জেন। চেঁচিয়ে উঠল–'ওঁর কটি থেকে ছোরা টেনে নিয়ে সিংহিনীর পাঁজরায় বিঁধিয়ে দাও। টারজান তো নিজের হাত সরিয়ে নিতে পারছে না।'

কেবিনের কয়েক মাইল দক্ষিণে, এক টুকরো বালি-ঝকঝক সৈকতে দাঁড়িয়ে আছেন দুটি বৃদ্ধ। তর্কে রত বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে।

ফিলান্ডার বলছেন, স্যামুয়েল টি. ফিলান্ডার–'দেখ ভাই অধ্যাপক, আমি এখনও বলছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর মূরদের উপরে ফার্ডিনান্ড-ইসাবেলা স্পেনে যে যুদ্ধগুলি জিতেছিলেন, সেগুলি না জিতলে পৃথিবীর মানুষ আজ হাজার বছর এগিয়ে যেতো। মূরেরা বাস্তবপক্ষে খুবই উদারপন্থী জাতি ছিল। তারা ছিল সহিষ্ণু কৃষিজীবী, শিল্পী, বণিকের জাতি। ইউরোপ, আমেরিকায় যেটুকু সভ্যতা আমরা আজকাল দেখতে পাই, তা যে টিকে আছে এখনও, সে শুধু ঐ ওদেরই জন্য।'

মিস্টার ফিলান্ডারের কথা শেষ হতে পেলো না। ডক্টর আর্কিমিডিস কিউ পোর্টার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন–'কী যে বল ভাই ফিলান্ডার, ওদের ঐ যে ধর্ম, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ওর আওতায় কোনো সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব?'

হঠাৎ মিস্টার ফিলান্ডার চমকে উঠলেন–'ভাই প্রোফেসর, কে যেন আসছে না? ঐ জঙ্গলের দিক থেকে?'

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

আলপসের তুষার রাজ্যে ম্যাম'জেল এক্স (কার্তিক সংখ্যার পর)

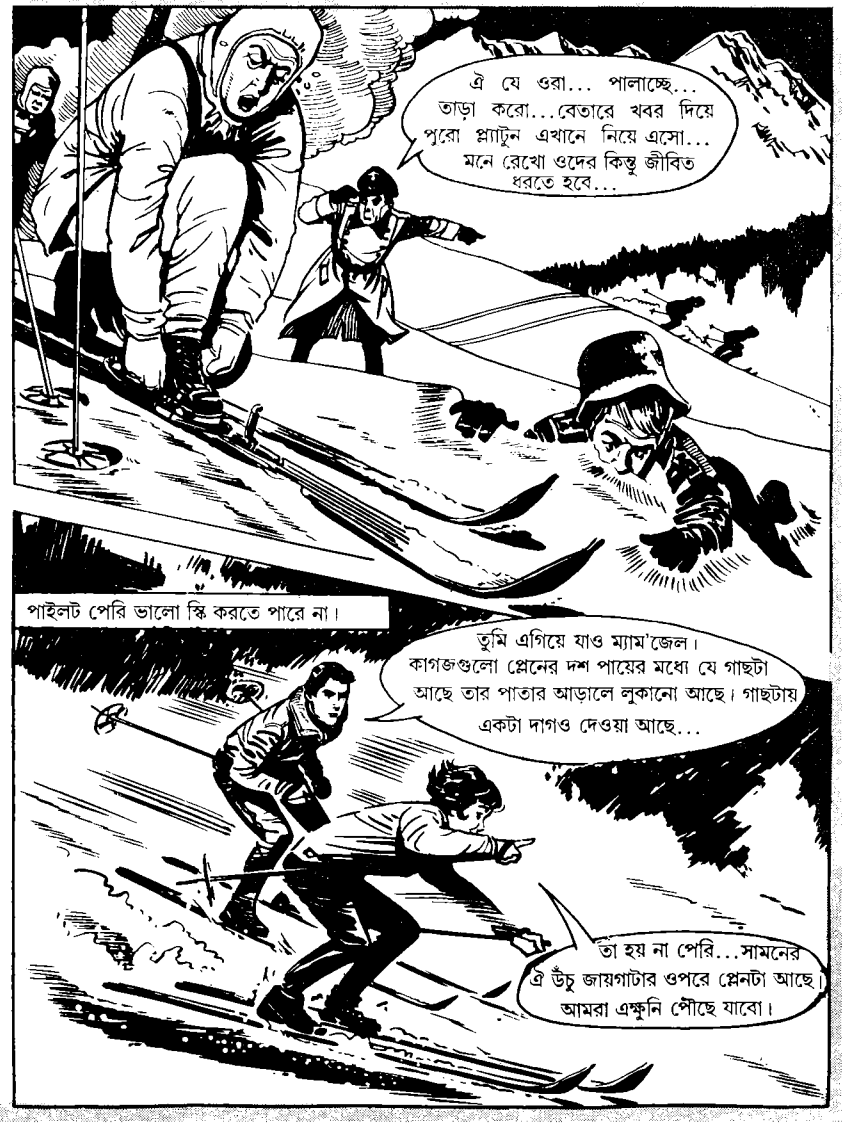

উঁচু জায়গাটায় পৌঁছে পেছন ফিরতেই...
পেরি কুইক... ওরা এসে গেছে...
ওরা আমাদের ধরে ফেলবে...
ম্যাম'জেল পেরিকে টেনে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে দ্রুত নামতে লাগলো...
কাগজগুলোর কথা ভুলে যাও পেরি... আগে জার্মানদের হাত থেকে বাঁচতে হবে।

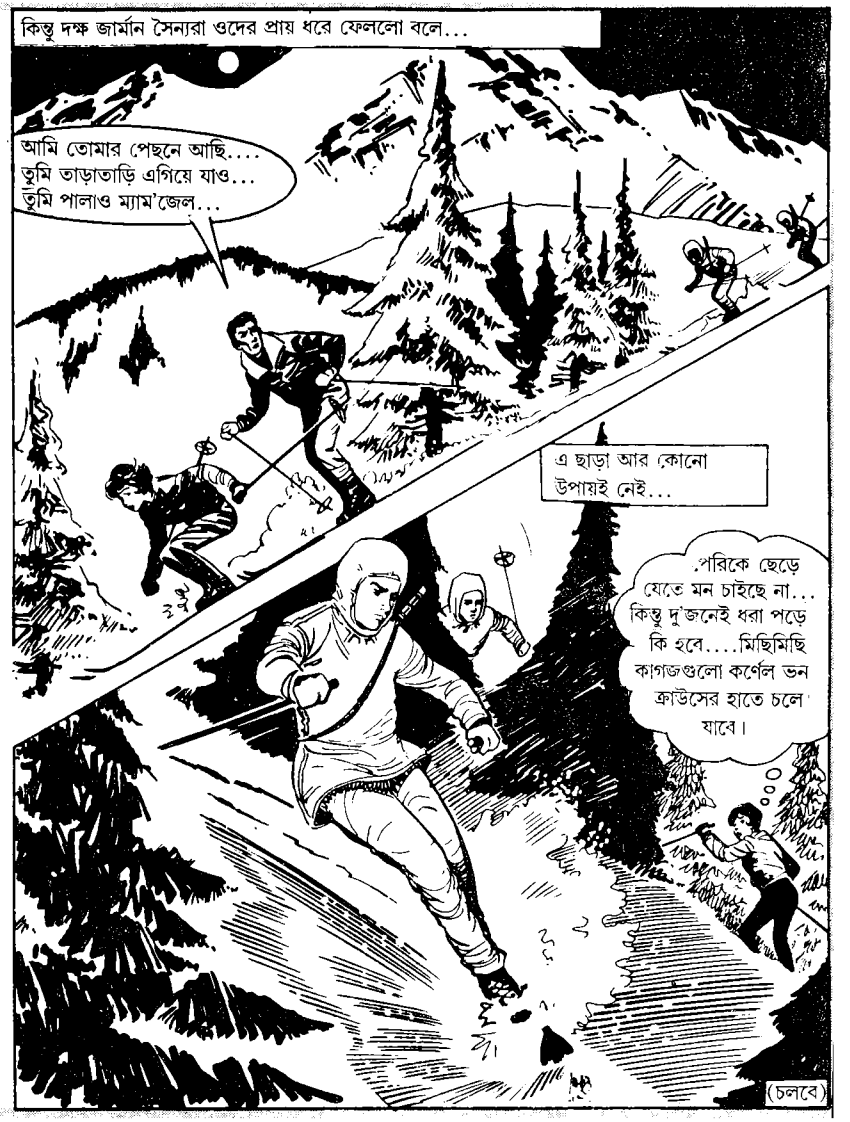
কিন্তু দক্ষ জার্মান সৈন্যরা ওদের প্রায় ধরে ফেললো বলে...
আমি তোমার পেছনে আছি.... তুমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও... তুমি পালাও ম্যাম'জেল...
এ ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই...
পেরিকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না... কিন্তু দু'জনেই ধরা পড়ে কি হবে....মিছিমিছি কাগজগুলো কর্ণেল ভন ক্রাউসের হাতে চলে যাবে।
(চলবে)

অমৃতকন্যা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নাম তার মৃড়ানী। বয়স হবে বছর দশ। সব সময় থাকে আপনমনে। সবাই যখন খেলছে সে তখন থাকে চুপচাপ একপাশে বসে।

সেদিনও মস্ত উঠোনটিতে বসেছে বাচ্চাদের খেলার আসর। তার বয়সী আর সব মেয়ে যখন খেলায় মেতে উঠেছে সে তখন বসে আছে চুপচাপ এক কোণাটিতে।

এসময় কোথা থেকে যেন সেখানে এসে হাজির হলেন এক ব্রাহ্মণ। আজানুলম্বিত বাহু, চোখের দৃষ্টি উদার-প্রশান্ত। ব্রাহ্মণ মৃড়ানীকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে বলেন, সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় চুপচাপ আছ মা?

ওসব খেলা আমার ভাল লাগে না।

মৃড়ানীর সে কথা শুনে ব্রাহ্মণ তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, কৃষ্ণে ভক্তি হোক।

ব্রাহ্মণকে কেমন যেন ভাল লেগে গেল মৃড়ানীর। সে জেনে নিল তাঁর ঠিকানা।

এর কিছুদিন পরেই মৃড়ানী তার দাদা অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে গেল বরানগরে মাসি বগলা দেবীর বাড়ি। বরানগরে আসার ব্যাপারে মৃড়ানীর উৎসাহটাই ছিল বেশি। উৎসাহের কারণ সেই ব্রাহ্মণ যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেটা বরানগর থেকে খুব একটা দূরে নয়।

মাসির বাড়ি এসেই মৃড়ানী খুঁজতে থাকে সেই ব্রাহ্মণের আস্তানা। তারপর হঠাৎ পেয়ে যায় তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের কাছে নিমতেখোলার একটা কলাবনে।

মৃড়ানী দেখে ব্রাহ্মণ চোখ বুজে ধ্যান করছে সেখানে। ব্রাহ্মণকে দেখে মৃড়ানীও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ধ্যান ভাঙতেই মৃড়ানীকে দেখে ব্রাহ্মণ বলেন, তুই এসেছিস, আয়।

এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি মৃড়ানীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার পরদিনই ছিল রাসপূর্ণিমা। সেই রাসপূর্ণিমার সকালে মৃড়ানীকে তিনি গঙ্গা থেকে স্নান করে আসতে বললেন। স্নান সেরে আসার পরই মৃড়ানীকে তিনি দিয়ে দিলেন মন্ত্রদীক্ষা।

ওদিকে মৃড়ানীর মাসির বাড়িতে তো হৈচৈ। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না মৃড়ানীকে। দাদা অবিনাশচন্দ্র একরকম পাগলের মতো খুঁজতে থাকে তাকে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবিনাশচন্দ্রও এসে হাজির হলো নিমতেখোলার সেই সাধকের কাছে। বোনের কথা জিজ্ঞেস করতেই সাধক বলেন, ভয় নেই, ও আছে আমারই কাছে। তারপরই তিনি ডাক দেন, মৃড়ানী-মৃড়ানী।

মৃড়ানী আসতেই সাধক অবিনাশচন্দ্রকে বলেন, দেখ বাবা,

ও ছেলেমানুষ, ওকে যেন বকাঝকা কোরো না। ও হলো হলদে পাখি, ওকে ধরে রাখা দায়।

অবিনাশচন্দ্র সাধকের ওসব কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। সাধক এবার মৃড়ানীকে বলেন, এবার ঘরে ফিরে যা মা। আবার ঠিক সময়ে দেখা হবে তোর সঙ্গে।

সাধককে প্রণাম করে ঘরে ফিরে যায় অবিনাশচন্দ্র আর মৃড়ানী।

এ ঘটনার বছর পনের পরে মৃড়ানীর বয়স যখন বছর পঁচিশ-সেই সময় একদিন মৃড়ানী ভাবের ঘোরে চলে আসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁকে দেখেই মৃড়ানীর মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা। মৃড়ানী বুঝতে পারে ইনিই সেই সাধক। কি যেন বলতে যায় মৃড়ানী কিন্তু পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মৃড়ানী থেকে যায় দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নিয়ে যান নহবতে সারদাদেবীর কাছে। হেঁকে বলেন, ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।

মৃড়ানীকে তখন রামকৃষ্ণ ডাকতেন গৌরী বলে আর মা সারদা বলতেন গৌরদাসী।

সেদিন ভোরে দক্ষিণেশ্বরে নহবতের সামনের বাগানে ফুল তুলছে গৌরদাসী। একটু দূরে বকুল গাছটার ডালটা ধরে তার গোড়ায় জল ঢালছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। হঠাৎ-ই তিনি বলে ওঠেন, দেখ গৌরী, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।

ফুল তোলা বন্ধ রেখে বিস্মিতা গৌরী বলল, এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো? এ যে সবই কাঁকর!

কথাটা শুনে হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, আমি কি বললুম আর তুই কি বুঝলি!

হঠাৎ-ই বড় গাঢ় হয়ে আসে ঠাকুরের গলা। তিনি বলে ওঠেন, জানিস গৌরী, এদেশের মেয়েদের বড় দুঃখু, তোকে ওদের মধ্যে কাজ করতে হবে।

এবার কথাটা বুঝতে পেরে গৌরী বলল, সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। ও আমার ধাতে সয় না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বলেন, না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে, এবার জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট।

কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলেন, জানিস, ওরা হচ্ছে জ্যান্ত জগদম্বা। ওদের সেবা করতে হয়–ওদের সেবা কর।

জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবা করার ভার শ্রীরামকৃষ্ণ তুলে দিয়েছিলেন যে গৌরীর ওপর–সবার কাছে তাঁর পরিচয় গৌরী মা হিসেবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় এই কন্যাটি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪ সালে চিকাগো থেকে লিখেছিলেন, 'এক হাজার গৌরীমা দরকার–ঐ নোবেল স্টিয়ারিং স্পিরিট (মহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে কাদা চটকাতে বলেছিলেন, বিবেকানন্দ যাঁর মতো আর হাজারটি মা পেলে নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই গৌরী মা'র জীবনটা প্রথম থেকেই নিবেদিত ছিল ঈশ্বরের জন্য–মানুষের জন্য।

সেসব গৌরীমা'র জন্মের আগের কথা। তাঁর মা গিরিবালা দেবী এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং মহামায়া তাঁর কোলে তুলে দিচ্ছেন অসাধারণ সুন্দরী জ্যোতির্ময়ী এক দেবকন্যাকে।

এই স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরেই সম্ভবত ১৮৫৭ সালে ভবানীপুরে মামার বাড়িতে জন্ম হয় গৌরীমা'র। নাম রাখা হয় তাঁর মৃড়ানী। মৃড়ানীর বাবার নাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে থাকতেন তিনি। রোজ সকালে পুজোপাঠ সেরে তবে তিনি যেতেন খিদিরপুরে এক সওদাগরী অফিসে চাকরি করতে। তখনও তাঁর কপালে থাকত চন্দনের ফোঁটা। এই নিয়ে সাহেব অনেক হাসাহাসি করেছেন, কিন্তু তার জন্য পার্বতীচরণের চন্দনফোঁটা পরা বন্ধ হয়নি।

মা গিরিবালা পিতৃসম্পত্তি পেয়েছিলেন। সে সব দেখাশোনা করার জন্য তাঁকে থাকতে হতো ভবানীপুরে। অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন গিরিবালা। কোনোদিন কোনো অন্যায়ের সঙ্গে যেমন আপোস করেননি, তেমনি কোনো ভয়ের কাছেই মাথা নিচু করেননি কোনোদিন।

মৃড়ানীর মধ্যেও ছিল বাবা-মা'র ধার্মিক মনোভাব আর চারিত্রিক দৃঢ়তা। অন্যদিকে সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি আপনভোলা। সবসময় তিনি ঠাকুর-দেবতার পুজোয় ব্যস্ত। ছোটবেলা থেকেই মাছ খেতেন না। ভাল জামাকাপড় পরার দিকেও ছিল না তাঁর কোনো ঝোঁক। এমনকি অনেক সময় নিজের ভাল জামাকাপড় তিনি দিয়েও দিতেন অন্যকে।

একদিন দাদার সঙ্গে নৌকো করে যাচ্ছেন মৃড়ানী। হাতে রয়েছে একজোড়া সোনার বালা। হঠাৎ মনে হয় তাঁর, আচ্ছা লোকে গয়না পরে কেন? গয়না কি খেতে খুব ভাল?

এই না ভেবে হাতের বালাটি খুলে চিবুতে থাকেন তিনি।

প্রকাশিত হলো

পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত
নতুন সংস্করণ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে
ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
ফুটবল খেলার আইন কানুন
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেস্ট সেলার
খেলার রাজা ফুটবল
বাদশা গোলাম
আমাদের সেরা খেলোয়াড়
আমাদের মতো খেলো
মারাদোনা-মারাদোনা
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্রিকেটের বই
শীতের দুপুরে দুই প্রতিবেশী
ব্যাটের রাজা গাভাসকার
ক্যারিবিয়ানের কড়চা
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কলমে দুই ক্লাব
ক্লাবের নাম মোহনবাগান
ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল

যে কোনো বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে। ঘরে বসে পেতে হলে নিচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন।

RBC ADVTG/DSK/6

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা–৭৩

না, কোনো স্বাদই নেই। এবার দুটো বালাই তিনি সবার অলক্ষ্যে ফেলে দেন জলে।

মেয়ের অবস্থা দেখে মা একদিন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন পাড়ার চন্ডীমামার কাছে। চন্ডীমামা মস্ত জ্যোতিষী। মৃড়ানীর হাত দেখে তিনি বলেন, ও দিদি, এ মেয়ে তোমার সংসার করবে না, এ মেয়ে হবে যোগিনী, ঘুরবে তীর্থে তীর্থে।

এই চন্ডীমামার কাছেই মৃড়ানী শুনতেন তাঁর তীর্থভ্রমণের নানা গল্প আর ভাবতেন, কবে এমন করে ঘুরতে পারবেন তিনি।

চন্ডীমামাই মৃড়ানীকে বলেন গৌরাঙ্গদেবের কথা। সে সব কথা শুনতে শুনতে গৌরাঙ্গদেবকে খুব ভাল লেগে যায় মৃড়ানীর। পরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পড়ে তাঁর ওপর।

নিমতেখোলার সেই সাধকের কাছে মন্ত্র নেবার পরই কোথা থেকে এক ব্রজরমণী এল তাঁদের বাড়িতে। তার কাছে ছিল রাধা দামোদর নামে এক শালগ্রাম শিলা। জীবন্ত মানুষের মতো শিলাটির সঙ্গে ব্যবহার করত সে রমণী। যাওয়ার আগে শিলাটি সে মৃড়ানীকে দিয়ে বলে, ভারি জাগ্রত আমার এই ঠাকুরটি। তোমাকে দেখে মজেছে এ, তাই তুমিই নাও ওকে। খুব যত্ন করে রেখো কিন্তু, ঠিকমত পুজো-আচ্চা করো, কেমন!

সেই থেকে সেই দামোদর হলো মৃড়ানীর প্রাণ। দিনরাত তাঁরই পুজোতে কাটত মৃড়ানীর সময়। তিনি ঠিকই করে ফেলেন বিয়েই করবেন না। এই দামোদরই হবে তাঁর সব।

মৃড়ানীর যখন বছর এগার বয়স–সেই সময় কুমারী ফ্রান্সিস মেরিয়া মিলম্যান ভবানীপুরে মেয়েদের জন্য খোলেন একটি স্কুল। সেখানে ভর্তি হলেন মৃড়ানী। সব বিষয়ে সেরা ছাত্রী হয়ে তিনি স্কুল থেকে পান স্বর্ণপদক। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে স্কুলের অনুদার নীতির জন্য তিনি স্কুল ছেড়ে দেন।

স্কুল ছাড়লেও পড়াশোনা কিন্তু বন্ধ হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা-চন্ডী সব তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। এই সময়ে তাঁর বিয়ে দেবার যখন কথা উঠল তখনই বেঁকে বসেন মৃড়ানী। তবু যখন সবাই চেষ্টা করে তখন তিনি বলেন, তাহলে তেমন বরকেই আমি বিয়ে করব যার মরণ নেই।

মৃড়ানীর কথায় হাসে সবাই। কিন্তু তাঁর যেন ধনুকভাঙা পণ। যা বলেছেন তাই করবেন। তাই পাত্রপক্ষরা তাঁকে পছন্দ করলেও তাঁর পণের কথা শুনে পিছিয়ে যায় সবাই।

শেষমেষ ঠিক হয় মৃড়ানীর ভগ্নিপতি পানিহাটির ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া হবে তাঁর। শুনেই তো মৃড়ানী হয়ে ওঠেন রুদ্রাণী। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিয়ের আয়োজন হতে থাকে। বাধ্য হয়ে মৃড়ানী বিয়ের রাতে পালান। তবু সবাই বলে ওই ভোলানাথের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে।

দিন কাটে। মৃড়ানী এখন আরো বেশি পুজো-আচ্চা করেন, আরো বেশি ধ্যান করেন। আর এইভাবেই একদিন গঙ্গাসাগর মেলা থেকে পশ্চিমা সাধুদের সঙ্গে চলে যান হৃষিকেশে। সেখানে গিয়ে সাধনা করতে থাকেন। সাধুসঙ্ঘে তাঁর নাম হয় গৌরীমায়ী।

গৌরীমা'র যখন বছর পঁচিশ বয়স তখন বলরাম বসুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের কাছেই থাকেন তিনি। এখান থেকেই একদিন ভাবের ঘোরে তিনি হাজির হন দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণকে দেখেই চিনতে পারেন তিনি। বুঝতে পারেন তাঁর ঠাকুরের আসনে পড়েছিল যে দুটি পায়ের ছাপ–তাও শ্রীরামকৃষ্ণেরই। আর তাই তিনি থেকে যান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই। আশ্রয় পান নহবতখানায় মা'র সঙ্গিনী হিসেবে।

বিবেকানন্দকে যেমন রামকৃষ্ণ বলেছিলেন মানুষ গড়তে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে, গৌরীমাকেও তেমনি বলেছিলেন দেশের মেয়েদের গড়তে–ওই জাগ্রত জগদম্বাদের সেবায় লাগতে।

ঠাকুরের নির্দেশ আর শ্রীমার উৎসাহেই গৌরীমা ১৮৯৪ সালে বারাকপুরে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম। একটা ছোট কুঁড়েঘরে জনা পঁচিশ কুমারী, সধবা আর বিধবা নিয়ে শুরু হলো আশ্রম। শুরু হলো তাদের শিক্ষাদান।

গৌরীমা বুঝেছিলেন, পুরোপুরি মেয়েদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এমন একটি সন্ন্যাসিনী সংঘের বড় দরকার। তাই তিনি উপযুক্ত সন্ন্যাসিনী গড়ার দিকে মন দিলেন।

দিন যত যায়, আশ্রম তত বড় হয়। গৌরীমা বুঝলেন কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না রাখলে ভালভাবে আশ্রম চালানো যাবে না। তাই ১৯১১ সালের প্রথমদিকে গোয়াবাগানে তিনি একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। সেখানে জনা দশ-বারো কুমারী ও বিধবা থাকতেন এবং জনা ষাটেক মেয়ে পড়তে আসত।

আশ্রমের কাজ বাড়তে থাকে, ফলে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে আশ্রম নিয়ে যাওয়া হয়। অবশেষে ২৬ নং হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে ৪ কাঠা জায়গা কেনা হয়। ১৯২৪ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ নতুন বাড়িতে আশ্রমের কাজ শুরু হলো। আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা পঞ্চাশ আর দৈনিক ছাত্রীর সংখ্যা তিনশ।

গৌরীমা ভারতীয় মেয়েদের ভারতীয় রীতিতে শিক্ষা দেবার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই রীতিতেই তিনি ওই শ্রীশ্রী-সারদেশ্বরী আশ্রমে মেয়েদের তৈরি করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন কাদা চটকাতে, সেই নির্দেশ তিনি আজীবন পালন করে গেছেন। তাঁর কর্মতৎপরতা দেখে শ্রীমা বলেছিলেন, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।....গৌরদাসী কী মেয়ে? ও তো পুরুষ। ওর মতো পুরুষ কটা আছে! এই স্কুল, গাড়ি, ঘোড়া সব করে ফেললে। ঠাকুর বলতেন, মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনই মেয়ে নয়–সেই তো পুরুষ।'

মেয়ে হয়েও 'সেই পুরুষ' গৌরীমা ঠাকুর নির্দেশিত কাজটুকু করে ১৩৪৪ সালের (১৯৩৮ খৃঃ) ১৬ ফাল্গুন শিবরাত্রির দিন বললেন, 'ঠাকুর সুতো টানছেন।' তারপর শেষরাতে তাঁর দামোদরের ভার দিলেন অন্যের উপর, আর পরদিন ১৭ই ফাল্গুন তাঁর ঠাকুর সুতো টেনে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁরই কাছে।

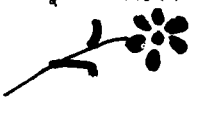

এই মাসে

সুবন্ধু শর্মা

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিন–

১ নভেম্বর, ১৮৮১ঃ কলকাতায় দারুণ হৈচৈ। কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালালো শিয়ালদহ থেকে বৌবাজার পর্যন্ত।

৩ নভেম্বর, ১৫৫৬ঃ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিক্রমজিৎ হিমুকে পরাজিত এবং নিহত করে সম্রাট আকবর ভারতবর্ষে প্রকৃত মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন।

৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ঃ দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের বিচার শুরু করলো ভারতের ইংরাজ শাসক।

৬ নভেম্বর, ১৯৪৩ঃ জাপানীরা তাদের অধিকৃত আন্দামান এবং নিকবর দ্বীপ দুটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে সমর্পণ করলো। নেতাজী এই দ্বীপ দুটির নতুন নামকরণ করলেন– শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপ।

৭ নভেম্বর, ১৮৬২ঃ শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ বন্দী অবস্থায় রেংগুনের কারাগারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

১০ নভেম্বর, ১৬৫৯ঃ হীন চক্রান্তকারী আফজল খাঁকে প্রতাপগড় দুর্গে শিবাজী আলিংগনছলে হত্যা করলেন।

১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯–স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন।

১৫ নভেম্বর, ১৯১৩ঃ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ এই দিনেই প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছিল।

১৬ নভেম্বর, ১৮৩৫ঃ সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিকন্যা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জন্ম।

১৮ নভেম্বর, ১৭২৭ঃ মহারাজা জয়সিংহ কর্তৃক জয়পুর শহরের প্রতিষ্ঠা। এই শহরের পরিকল্পনায় ছিলেন একজন বাঙালী স্থপতি–বিদ্যাধর চক্রবর্তী।

২১ নভেম্বর, ১৯২১ঃ ইংলন্ডের প্রিন্স অফ ওয়েলস বোম্বাই শহরে এসে অবতরণ করলে জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় হরতাল পালন করলো।

২১ নভেম্বর, ১৯৬৩ঃ থুম্বা থেকে একটি রকেট উৎক্ষেপণ করে ভারত প্রথম মহাকাশ অভিযানের সূচনা করলো।

২৬ নভেম্বর, ১৮৯০ঃ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম।

২৯ নভেম্বর, ১৯৬১ঃ পৃথিবীর প্রথম রাশিয়ান মহাকাশযাত্রী উরি গ্যাগারিন ভারতবর্ষে এলেন।

৩০ নভেম্বর, ১৭৫৯ঃ ভেঙেপড়া মুঘল রাজত্বের সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর নিজের মন্ত্রীর হাতেই নিহত হলেন।

৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮ঃ বাঙালী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ভাই ফোঁটার পর এখন সব কিরকম যেন খালি খালি লাগছে তাই না। তবে এখনো দুম-দাম বাজির শব্দ কানে আসছে। ওদিকে দক্ষিণে হাওয়া ঘুরে গেছে উত্তর দিকে। হিমালয়ের হিম মেখে সেই হাওয়া বয়ে আনছে শীতের পরশ। শীতের সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় ফুলকপি, নতুন গুড়ের সন্দেশ আর ক্রিকেট। তা এবার তো ক্রিকেটের আসর অক্টোবর মাস থেকেই বসে গেছে। ইডেনে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচও হয়ে গেছে। আসলে আসছে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট তো–তাই অনেক আগে থেকেই এবার সব দেশ তৈরি হচ্ছে। সেই জন্যেই ঐ সব খেলা টেলা। এই দেখো না শারজায় খেলা হলো, পাকিস্তান ভারতে এসে একদিনের ক'টা মাচ খেলে গেলো, এখন ভারত যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতীয় খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসবেন বিশ্ব কাপের খেলা শেষ করে।

সে যাই হোক–তোমাদের খবর বলো। কার বাগানে কি ফুল ফুটছে ? নিজের হাতে পোঁতা গাছে যখন ফুল ফোটে তখন কি আনন্দই না হয় ! কলকাতায় যারা থাকো আর বাড়িতে গাছ পোঁতার জায়গা নেই তারা তো টবে ফুলের চারা লাগাতে পারো। একটু যত্ন করলেই দেখবে টবে কি সুন্দর ফুল ফুটছে। শীতকালে নানারকম মরশুমী ফুল ফোটে–লাগাও না কিছু। ডালিয়া টালিয়া না পারলে অন্তত চন্দ্রমল্লিকার চারা লাগাও। সাদা আর হলুদ–এই দু রকমের চন্দ্রমল্লিকার চারা লাগাও। দেখবে চারদিক কেমন আলো করে ফুল ফুটে থাকবে। বাড়িসুদ্ধু সকলেই দেখবে তখন কিরকম খুশি হবেন। আসলে ফুলের মতো ভালো জিনিস আর কিছু হয় না। ফুলের বাহার আর সৌরভ মন-টন ভালো করে দেয়।

শুকতারার এক বন্ধু চিঠি লিখেছে, তার বাবা একটা হাল্কা হলদে রংয়ের মিটমিটে তারাকে দেখিয়ে বলেছেন যে ওটা শনি। কিন্তু বলয় ছিলো না বলে তার বাবার কথা বিশ্বাস হয়নি। তার মতে বলয় ছাড়া শনির কথা তো ভাবাই যায় না। তাহলে কি ওর বাবা ভুল তারা চিনিয়েছেন ?

মোটেই না। উনি ঠিকই দেখিয়েছেন। শনি তার অক্ষে প্রায় ২৭ ডিগ্রি হেলে আছে। তাই তার বলয়টা পৃথিবী থেকে পুরো নজরে আসে না। কখনো বেশ খানিকটা দেখা যায়। কখনো আবার একেবারেই দেখা যায় না। যখন বলয়টা আমাদের মানে পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে তখন শনিকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। হাল্কা হলদে রং জ্বলজ্বল করে। যদি কখনো শক্তিশালী দূরবীনে শনিকে দেখার সুযোগ পাও তাহলে নিশ্চয়ই দেখবে কিন্তু। শনিকে তখন কি সুন্দর যে দেখতে লাগবে তা কল্পনাও করতে পারবে না। ক'বছর আগে অষ্টগ্রহ সম্মেলনের সময় আমি শনিকে খালি চোখে দেখেছিলাম। তখন গ্রহগুলো তো পৃথিবীর খুব কাছে এসে গিয়েছিলো। শনিকে তার বলয়সুদ্ধু দেখতে কি যে ভালো লেগেছিলো কি বলবো। এখন আমাদের বন্ধু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, ওর বাবা শনিকে ঠিকই চিনিয়েছেন। সত্যি রাত্তির বেলায় আকাশে তারাগুলোকে যদি চিনতে পারো তাহলে তার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই পাবে না। তাই একটি একটি করে তারা চিনে রাখো। চিনে রাখো গ্রহদের। আচ্ছা এবার একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখি। সূর্যই তো আমাদের সব কিছু সূর্যকে কেন্দ্র করেই আমরা আবর্তিত হচ্ছি। বলো তো সূর্যের ব্যাস কতো ? পারলে না তো ? মনে রেখো সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৪ লক্ষ কিলোমিটার। কেউ জিজ্ঞেস করলে এখন নিশ্চয়ই চট করে বলে দিতে পারবে–তাই না ? আর গ্রহগুলো সূর্য থেকে কতো দূরে আছে তাও জেনে রাখা ভালো। অবশ্য গ্রহগুলো এতো দূরে আছে যে ঐ সব দূরত্বের হিসেব-টিসেব মনে রাখাই মুশকিল। তবে কেউ জিজ্ঞেস করলে শুকতারার বন্ধুরা যাতে ঠকে না যায় সেই জন্যে সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্বের হিসেব দিয়ে দিলাম। মনে রাখবে শুকতারার কোন সংখ্যায় আছে–দরকার পড়লে তাহলে চট করে দেখে নিতে পারবে। তবে তার আগেজেনে নিতে হবে সূর্য থেকে পৃথিবী কতো দূরে। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কমে বাড়ে। তবে এই দূরত্বকে ১৪,৯৫,৯৭০০০ কিলোমিটার বলে ধরে নিতে হবে। এই হিসেবটা মনে রাখার চেষ্টা কোর। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার কিলোমিটার। ভাবা যায় ? আচ্ছা বলো দেখি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতো সময় নেয় ? আট মিনিট। আলোর গতি কতো জানো ? সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

সূর্য থেকে অন্য গ্রহগুলোর দূরত্বের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সূর্যর সব থেকে কাছের গ্রহ হলো বুধ। সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব হলো ৫,৭৯,০০,০০০ কিলোমিটার। তারপরই শুক্র–১০,৮২,০০,০০০ কিলোমিটার। এরপর পৃথিবী। পৃথিবীর কথা তো আগেই বলেছি। পৃথিবীর পরেই মঙ্গল। মঙ্গল সূর্য থেকে ২২,৭৯,৪০,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। এরপর বৃহস্পতি–৭৭,৮৩,৪০,০০০ কিলোমিটার। বৃহস্পতির পর শনি। শনি আছে সূর্য থেকে ১৪২,৭০,০০,০০০ কিলোমিটার দূরে। ইউরেনাসের দূরত্ব ২৮৬,৯৬,০০,০০০ কিলোমিটার। এরপর নেপচুন–৪৪৯,৬৭,০০,০০০ কিলোমিটার। সবশেষে প্লুটো। প্লুটোই আছে সূর্য থেকে সব থেকে দূরে। সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব ৫৯০,০০,০০,০০০ কিলোমিটার।

আজ তাহ'লে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

–তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

কমলেশ রায়, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী, বিবেকানন্দ মিশন স্কুল

রাগ

বাঘের রাগে বন কাঁপে আর,
বাবার রাগে ঘরবাড়ি।
জেঠু যখন রেগে ফায়ার,
দৌড়ে তখন ঘর ছাড়ি।
মা যখন রেগে চেঁচান,
সবাই থাকি চুপচাপ।
দাদু যখন খড়ম নাচান,
পালাই সবাই ধুপধাপ।
আমার কিন্তু রাগটি হলে,
যখন লাফাই ঝাঁপাই।
সবাই কেন হেসে বলে,
ঐ খেপেছে পাপাই?

জীতেন দাম
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী
সেন্ট টমাস স্কুল
চন্দননগর

এই তো ভালো

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। চারদিকে তাই হৈচৈ। আমাদের বাড়িতেও সেই একই অবস্থা।

শরতের টুকরো টুকরো মেঘ যেন এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। ছোট পিসি, বড় পিসি, কাকু, ভালো মামা প্রত্যেকেই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকের হাতে মিষ্টির প্যাকেট আর রসগোল্লার হাঁড়ি।

দাদাই-এর আজ ভারী মজা। প্রত্যেকে দাদাই-কে জড়িয়ে আদর করছে। বাবাও আজ ছুটি নিয়েছেন। দাদাই-এর মুখে হাসির ঝলক, ও ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে! তার ওপর পাঁচ-পাঁচটা বিষয়ে লেটার!

এই তালে আমারও পেট ভরে মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেল।

সব থেকে মজার ব্যাপার, অন্যবারের মতো এবার কিন্তু বাবার সঙ্গে দাদাই-এর কথা কাটাকাটি বা মন কষাকষি হয়নি। স্কুলে ক্লাসে ওঠার সময় প্রতিবছরই দাদাই-এর মুখ গোমড়া হয়ে যেত। দাদাই-এর ইচ্ছে, উমাপতিবাবুর কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়ার। তাহলেই নাকি ও ক্লাসে প্রথম হবে। ফণি আর ফার্স্ট হতেই পারবে না। দাদাই আর ফণির মধ্যে বহুদিনের ঠাণ্ডা লড়াই। কেননা দাদাই প্রতি বছরই ক্লাসে ওঠার সময় সেকেণ্ড হয়, এটাই দাদাই-এর মস্ত বড় দুঃখ। কিন্তু বাবার সেই একই কথা স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের কোচিং-এ পড়ে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া খুব বাহাদুরির কথা নয়। বাহাদুরি দেখাতে হলে বোর্ডের পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়ে দেখাবে। স্কুল জীবনে দাদাই-এর তাই ফার্স্ট হওয়া হলো না।

মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বর হাতে পাবার পর দাদাই-এর সব ব্যথা বেদনা দূর হয়ে গেল। ফণি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলেও দাদাই-এর থেকে অনেক কম নম্বর পেয়েছে। লেটার মাত্র একটা বিষয়ে!

বাড়িতে টেবিলে রাখা খবরের কাগজের ওপর হঠাৎ চোখ পড়লো বাবার। একটা বেবিফুডের বিজ্ঞাপন—হাসি খুশিতে ভরা ছোট্ট স্বাস্থ্যবান এক শিশুকে তার মা আদর করছে। মায়ের চোখে এই ছোট্ট শিশুকে নিয়ে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমার দাদাইও আমাদের বাড়ির আমাদের বংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

সহেলি ভট্টাচার্য, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, কমলা বিদ্যামন্দির গার্লস হাইস্কুল, কলিকাতা—৮৫

মহবুব হাসান, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদ

সঞ্জয় সেন
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
সেন্ট্রাল স্কুল, মালিগাওঁ, গৌহাটি

বুলবুলি

ধরেছিলাম একটা পাখি
বুলবুলি তার নাম
নীল আকাশে উড়েই গিয়ে
খোয়ালো মোর মান।
অনেক স্বপ্ন, কত আশায়
খাঁচায় তাকে রাখি
দূর গগনে হারিয়ে গিয়ে
আমায় দিল ফাঁকি।
ভুলই আমি করেছিলাম
বন্দী করে তাকে
শাস্তি আমায় পেতে হলো
তাইতো হাতে নাতে।

সঞ্জয় নন্দী
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুল,
মেদিনীপুর

ভ্রমণকারী

আমি একজন ভ্রমণকারী
দেশে দেশে ঘুরি
ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম
নিউ জলপাইগুড়ি।
সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে
যাব রাউরকেল্লা
তারপরেতে দিল্লী গিয়ে
দেখবো লাল কেল্লা।
উড়োজাহাজ চেপে রে ভাই
কলকাতাতে যাব
মনুমেন্ট আর ইডেন দেখে
পাতাল রেলে চড়ব।
যতই ঘুরি যতই বেড়াই
কিন্তু জেনো ভাই,
জন্মভূমির চাইতে ভাল
জায়গা কোথাও নাই।

দেবোপম চক্রবর্তী
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী
জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল

অঞ্জনা নাহা
বয়স পনেরো, একাদশ শ্রেণী,
এইচ. এস. স্কুল, বদরপুর,
আসাম

আমার বার্বি পুতুল

সেই দিনের কথা আমি আজও ভুলবো না। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। একদিন মাঝরাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আমার দেশে আমি আর নেই। কোথায় যেন চলে এসেছি। আমার ভীষণ ভয় করল, আমি কেঁদে ফেললাম। এমন সময় টের পেলাম কে যেন আমায় ডাকছে। দেখি যে একটা সুন্দর বার্বি পুতুল। এমনিতেই আমি বার্বি পুতুল নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসি। তার ওপর একটা জ্যান্ত বার্বি পেয়ে দারুণ খুশি হলাম। সে আমাকে বলল, চল, আমার বাড়িতে। ওদের বাড়িটা খুব অদ্ভুত। বাড়িটা প্লাস্টিকের তৈরি। তার গায়ে নকশা আঁকা। সে আমায় বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। বাড়িটা আমাদের একটা খাটের সমান। তাতে অনেক বার্বি পুতুল বসে নয়তো দাঁড়িয়ে নানা কাজ করছে। আমার তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মা, বাবার জন্য মন কেমন করতে লাগল। চলে আসার জন্য আমি বার্বিদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারপর হঠাৎ দেখি কোথায় কি? আমি বিছানায় শুয়ে আছি।

শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী সল্টলেক

বিশ্বজিৎ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

জীবনমরণ

নন্দিনী ঘোষ

মা বললেন, 'সম্বু আজ রাতে আর বই খুলে বসিস না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়িস, নাহলে কাল সকালে শরীর খারাপ লাগবে।' কিন্তু সোমনাথ জানে শুলেও আজ তার ঘুম আসবে না। আর হলোও তাই। পরের দিনের জন্য একটা ভীষণ টেন্‌শন তো আছেই, তাছাড়া কত কথা, তার নিজের কথা, বাবার কথা সব মনে পড়তে লাগল। আগামীকাল সোমনাথের জীবনে বিশেষ এক দিন–চন্দননগর থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতা। বহুদিন ধরেই এই দিনটার জন্য তৈরি হচ্ছে সোমনাথ। সাঁতার সে জানে বললে ভুল বলা হবে। বলতে গেলে সে জলেরই পোকা। ছোটোবেলা থেকে বাবার সঙ্গে সে রোজ গঙ্গা এপার-ওপার করেছে। তার বাবাও ছিলেন খুব দক্ষ সাঁতারু। প্রথম জীবনে অনেক পুরস্কার, অনেক সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যরকমের দুঃখজনক ব্যাপার যে সেই জলেই তাঁর মৃত্যু লুকিয়েছিল। বছর ছয়েক আগে একদিন ডুব সাঁতার দিতে গিয়ে মাঝগঙ্গায় রাখা নৌকার তলায় মাথায় ধাক্কা লেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আর উঠে আসতে পারেননি জল থেকে।

বাবার এই শোচনীয় মৃত্যুর পরও কিন্তু মা সোমনাথকে জলে নামতে বারণ করেননি। বরং বলেছেন যে বাবার অসমাপ্ত কাজ তো তাকেই শেষ করতে হবে। বাবা যে চেয়েছিলেন সোমনাথ খুব বড় সাঁতারু হোক। দেশে-বিদেশে নাম করুক। কাল সেই দিন। বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্য কাল সোমনাথ নিজেকে উজাড় করে দেবে। শুধু কি তাই ? পাড়ার অমরনাথবাবু, যিনি রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার, বলেছেন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারলে রেলের স্পোর্টস কোটায় সোমনাথের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। এই চাকরিটার যে কি ভীষণ দরকার। সে তো জানে, বাবা মারা যাবার পর থেকে মা কি প্রচন্ড পরিশ্রম করে তাদের তিন ভাই-বোনকে মানুষ করে আসছেন। সে কলেজের গন্ডী অবধি পৌঁছলেও ছোট দুই ভাইবোন তো এখনও স্কুলে পড়ে। এই চাকরিটা পেলে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে না হোক, কিছুটা নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বাঁচতে পারবে। কাল তাকে জিততেই হবে। যে কোনো মূল্যে জিততেই হবে। এ যে তার জীবনমরণ সমস্যা।

পরের দিন অনেক সময় হাতে থাকতেই সোমনাথ পৌঁছে গেল। ঘাটের ওপরের চাতালে বড় সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সেখানে অতিথি অভ্যাগতদের বসার আসন। একদিকে একটা জায়গা আলাদা করে ঘিরে প্রতিযোগীদের বিশ্রামের জায়গা, ডাক্তারী পরীক্ষাও হবে সেখানে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে বেলা একটায়। তাই এই দশটার সময় খুব বেশি ভিড় নেই। ঘুরতে ঘুরতে তার বন্ধু অরূপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সোমনাথের। অরূপের ধারণা সোমনাথ জিতবেই। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। একথা সেকথা হবার পর অরূপ বলল, 'জানিস, একটা নতুন ছেলে আসছে, মাত্র ক্লাস এইটে পড়ে। এই প্রথমবার নাম দিয়েছে। কলকাতার ছেলে।' সোমনাথ বলল, 'সে কিরে! কলকাতার ছেলে গঙ্গায় সাঁতারে পারবে তো?' অরূপ বলল, 'নারে, ছেলেটা নাকি খুব ভালো সাঁতার কাটে। ওখানে অনেক পুরস্কার-টুরস্কার পেয়েছে।'

আস্তে আস্তে সময় এগিয়ে এল। প্রতিযোগীরা সকলেই এসে গেছে। তাদের মধ্যে সেই ছেলেটাকেও দেখতে পেল সোমনাথ। কি ফর্সা সুন্দর দেখতে। একেবারে বাচ্চা। সঙ্গে তার বাবা, মা, দিদি সবাই এসেছে। দেখে মনে হলো ভীষণ বড়লোক। সোমনাথের মন খারাপ হয়ে গেল। তার বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। মা-এর পক্ষে সম্ভব নয় সব কাজ ফেলে এখানে আসা। আসবার সময় বাবার ছবিতে যখন প্রণাম করছিল মা বলেছিলেন, 'দেখিস তোর বাবা সবসময় তোর

সঙ্গে থাকবেন।'

বুকে একটা অদ্ভুত সাহস আর জেদ নিয়ে সোমনাথ সকলের সঙ্গে লাইন করে দাঁড়াল স্টার্টিং পয়েন্টে। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার জল তোলপাড় হতে লাগল। জলে ছেলেদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর তীর থেকে দর্শকদের, অভিভাবকদের চীৎকার, উৎসাহ প্রদান, হর্ষধ্বনির মধ্যে গঙ্গাতীরের বাতাস একেবারে মুখর হয়ে উঠল।

প্রথম থেকেই সোমনাথ অনেকটা এগিয়ে ছিল। সাবলীলভাবে জল কেটে এগিয়ে যেতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। তার বেশ খানিকটা পিছনে ছিল সেই নতুন ছেলেটা। শ্রীরামপুর অবধি একদমে আসার পর সোমনাথ কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। যাক, আর কিছুটা এই স্পীড রাখতে পারলেই আর চিন্তা নেই। সোমনাথ যেন সাঁতার শেষ হবার লাল ফিতেটা দেখতে পেল। পিছনের ছেলেটা কতটা দূরে আছে দেখবার জন্য একবার পিছন ফিরতেই সোমনাথ চমকে গেল–একি! ছেলেটা তো ডুবে যাচ্ছে। হাতদুটো বারবার ওপরের দিকে উঠছে। আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না কেন? সাহায্যকারী নৌকাটা তো অনেক দূরে। তারা কিছু দেখতে পায়নি। জলটা ওখানে অমন তোলপাড় হচ্ছে যে কিছু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। সোমনাথ এক মুহূর্তের জন্য থমকাল। নিমেষে মনস্থির করে ফিরে চলল ছেলেটার দিকে। তখন তীরের লোকজন সব বুঝতে পেরেছে। তীব্র একটা আর্তনাদ সোমনাথের হৃদস্পন্দনকে মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে দিল। বাবার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তার মায়ের তো ঠিক এমনই হয়েছিল না। ছেলেটাকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। সোমনাথ ডুব সাঁতার দিয়ে বহু কষ্টে ছেলেটার একটা পা ধরতে পেরে টানতে লাগল তীরের দিকে। কিন্তু সে তো এখনও অনেক দূর। ততক্ষণে সাহায্যকারী নৌকোগুলো ছুটে আসছে তাদের দিকে। বেশ কিছুক্ষণের অক্লান্ত চেষ্টায় অচৈতন্য ছেলেটাকে একটা নৌকার ওপর তুলতে পারল সোমনাথ। কিন্তু ততক্ষণে তারও সব শক্তি নিঃশেষিত। ডাক্তারবাবুর নির্দেশে ছেলেরা তাকেও জল থেকে তুলে নিল নৌকায়। সোমনাথের চোখের ওপর থেকে জয়ের স্বপ্নটা যেন শেষ বিকেলের শেষ আলোটুকুর মতোই ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকল। এতদিনের সব স্বপ্ন, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এক লহমায় ধ্বংস হয়ে গেল। প্রচন্ড দুঃখে আর হতাশায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ কানের কাছে যেন বাবার গলা শুনতে পেল সে, 'কাঁদছিস কেন সমু? বোকা ছেলে! তুই যে একটা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিস। প্রতিযোগিতায় জিততে অনেকেই পারে, কিন্তু কজন পারে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেও একটা মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে? তুই আজ এই সাঁতারে হেরে গিয়েও জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় জিতে গেছিস রে।' নৌকায় শুয়ে থাকা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে আর গৌরবে সোমনাথের মন ভরে উঠল।

• • • • •

বিশ্বজিৎ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

বিজয়ীর আনন্দ

স্বপনকুমার প্রামাণিক

সকাল থেকেই সারা বাড়িতে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। সুজয় আজ কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারছে না। থেকে থেকে মায়ের ভারী থমথমে মুখটা মনে পড়ছে। এবার পূজার ছুটিতে বাপী দেশের বাড়িতে গিয়ে কাটাতে চান। তাই বাপীর ইচ্ছে সুজয় ও তার মা যাক তাঁর সঙ্গে। অবশ্য প্ল্যান ছিল অন্যত্র যাওয়ার। কিন্তু দেশের বাড়ি থেকে কাকুদের জরুরী তলব এসেছে, গাঁয়ে গিয়ে দাদা-দিদি, ভাই-বোনেদের সঙ্গে কাটাতেই হবে। কিন্তু....

বুকটা ভারী হয়ে ওঠে বছর চারেক আগের সেই ঘটনা মনে করে। এখনও মাঝে মধ্যে ভেসে ওঠে চোখের সামনে সেই বীভৎস দৃশ্য। সুজয় সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দাদা অজয় ক্লাস থ্রী-তে পড়ে। সেবার পুজোয় সবাই গেছে দেশের বাড়িতে ছুটি কাটাতে। মেঠো রাস্তা, বন-বাদাড়, ধানী জমি, কাশবন, শাপলা-শালুক ভর্তি পুকুর। রঙবেরঙের ছবির বিপুল সম্ভার। দিন তিনেক অচেনা-অজানার আনন্দে খুব ভালো কাটলো ওদের। সুজয় সর্বক্ষণ মায়ের কাছে কাছে, তার দুই ডাগর চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

দুপুরে মা চান করতে যাবে। খোঁজ পড়ল অজয়ের। সবাই আছে অজয় নেই। খোঁজ খোঁজ চারদিক। গ্রামময় হৈচৈ পড়ে

গেল মুহূর্তে, বড়বাবুর বড় ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, ঘণ্টা তিনেক পর বনমালী মুনিষ এলো অজয়কে বুকে ধরে। মায়ের পায়ের কাছে শুইয়ে দিল অজয়ের নিঃসাড় দেহটা। হাতে ধরা একমুঠো ঘাস। অজয় শালুক তুলতে গিয়ে মাঠের পুকুরে জলডুবি হয়েছে। মুহূর্তে শোকের ছায়া নামল সারা পরিবারে। তিন দিন মায়ের জ্ঞান ফেরেনি, বাপী ছিল ক'দিন নির্বাক প্রতিচ্ছবি। এসব এখনও ভাসে সৃজয়ের চোখে। দাদার আলোকচিত্রটা দেখলে বুকটা মুচড়ে ওঠে এখনও। মনে পড়ে মায়ের প্রতিজ্ঞা। দেশের বাড়িতে আর যাবে না। সৃজয় ভাবছে দাদা যদি সাঁতার দিতে জানতো....সেই থেকে সৃজয় শুধু ভাবতো–সাঁতার কিভাবে শিখবো! কিন্তু মা ওকে লেকের ধারে যেতেই দেন না কোনোদিন।

কিন্তু ওদের আসতেই হলো গাঁয়ে। মায়ের সদা সন্ত্রস্ত ভাব সৃজয়কে ঘিরেই। তারই মাঝে সৃজয় খুঁজেছে কিভাবে সময় করে নেওয়া যায়। টিংকু ওর খুড়তুতো দাদা ওকে অভয় দিয়েছে, আটদিনেই তোকে সাঁতার শেখাবে।

দুপুরে বাবার ডাকে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। বাবার উৎকণ্ঠা জড়িত কণ্ঠস্বর, কি গো সৃজয় কোথায়? মা চিৎকার করে উঠলেন, না-আ। প্রায় গড়িয়ে পড়তেন খাট থেকে। বাবা ধরে ফেললেন।

আবার খোঁজ শুরু হলো। পিঙ্কি খানিক বাদে দৌড়ে এসে বলল, জ্যাঠাইমা দেখবে চল সৃজয়দা আর টিংকু দাদা কেমন পুকুরে সাঁতরাচ্ছে।

সবাই দৌড়ে গেলেন খিড়কির পুকুরে। দেখলেন সৃজয়, পিঙ্কির দাদা টিংকু দু'জনেই সাঁতার কাটছে মাঝ পুকুরে। সৃজয় মাকে দেখতে পেয়ে সাঁতরে পাড়ে এল। সিক্ত শরীরে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরল বিজয়ীর আনন্দে, মা, আমি সাঁতার দিতে পেরেছি।

মায়ের চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল চিক্‌চিক্ করতে লাগলো। চার বৎসর আগের দুর্ঘটনার শোক, না এটা সৃজয়ের নতুন জীবন প্রাপ্তির আনন্দের অভিজ্ঞান? বাপী সহসা ওকে বুকে তুলে নিলেন, সাবাস, এরপর আমরা প্রতিটি পুজোতেই আসবো এ গাঁয়ে। মায়ের দিকে ফিরতেই, মা হেসে বললেন, ঠিকই তো। সৃজয়ের গর্বোদ্ধত বুক আরও চওড়া হতে লাগলো বিজয়ের আনন্দে।

ছবি : সুফি

এঁদের লেখাও ভালো হয়েছে :–
অলক দত্ত চৌধুরী (ব্রহ্মপুর, গড়িয়া), বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া), অরূপ দত্ত (কৃষ্ণনগর, নদীয়া), পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, (হাইলাকান্দি, আসাম), সুশান্ত মাহাতো (চাঁদড়া, মেদিনীপুর), পৃথ্বিরাজ রায় (গুয়াহাটি, আসাম), বনিতা মজুমদার (প্রধান নগর, দার্জিলিং), সুব্রত পণ্ডিত (বাঁকুড়া), গংগাগোবিন্দ সিংহ (জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ), পাঞ্চালী দেব (শিলচর, আসাম), অশোককুমার প্রধান (বাণীপুর, হাওড়া), গীতা মুখার্জি (ঝলঝলিয়া, মালদা), দেবাশিস নাগ (পুরুলিয়া), আজহারুল হক্ (চুরুলিয়া, বর্ধমান), বিপ্লব পাল (খাগড়া, বহরমপুর), সুদীপ্ত সরকার (বালুরঘাট), অংশুমান রায় (কুলটী), অনিতা ভট্টাচার্য, তনুশ্রী পাল (কীর্তন খোলা), জয়েশ দাস (অন্ডাল), জয়তী রায় (নিউদিল্লী), অরুণোদয় ভট্টাচার্য (কলকাতা), দেবাশিস ঘোষ (বিদ্যানন্দপুর বাঁকুড়া)

ঘোষণা

হাওড়ার সালকিয়ার শম্ভু হালদার লেন থেকে বীরেন চন্দ্র তাঁর প্রয়াত ছোটভাই অনিমেষ চন্দ্র-র নামে একটি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অনিমেষ চন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

ভাইফোঁটার মজা

জন্ম : ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
মৃত্যু : ৯ই পৌষ ১৩৯৭

লেখা পাঠাবার শেষদিন ৩০ মাঘ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার – ৫০ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার – ৩০ টাকা

হাঁদা-ভোঁদার

ডাণ্ডা মেরামত

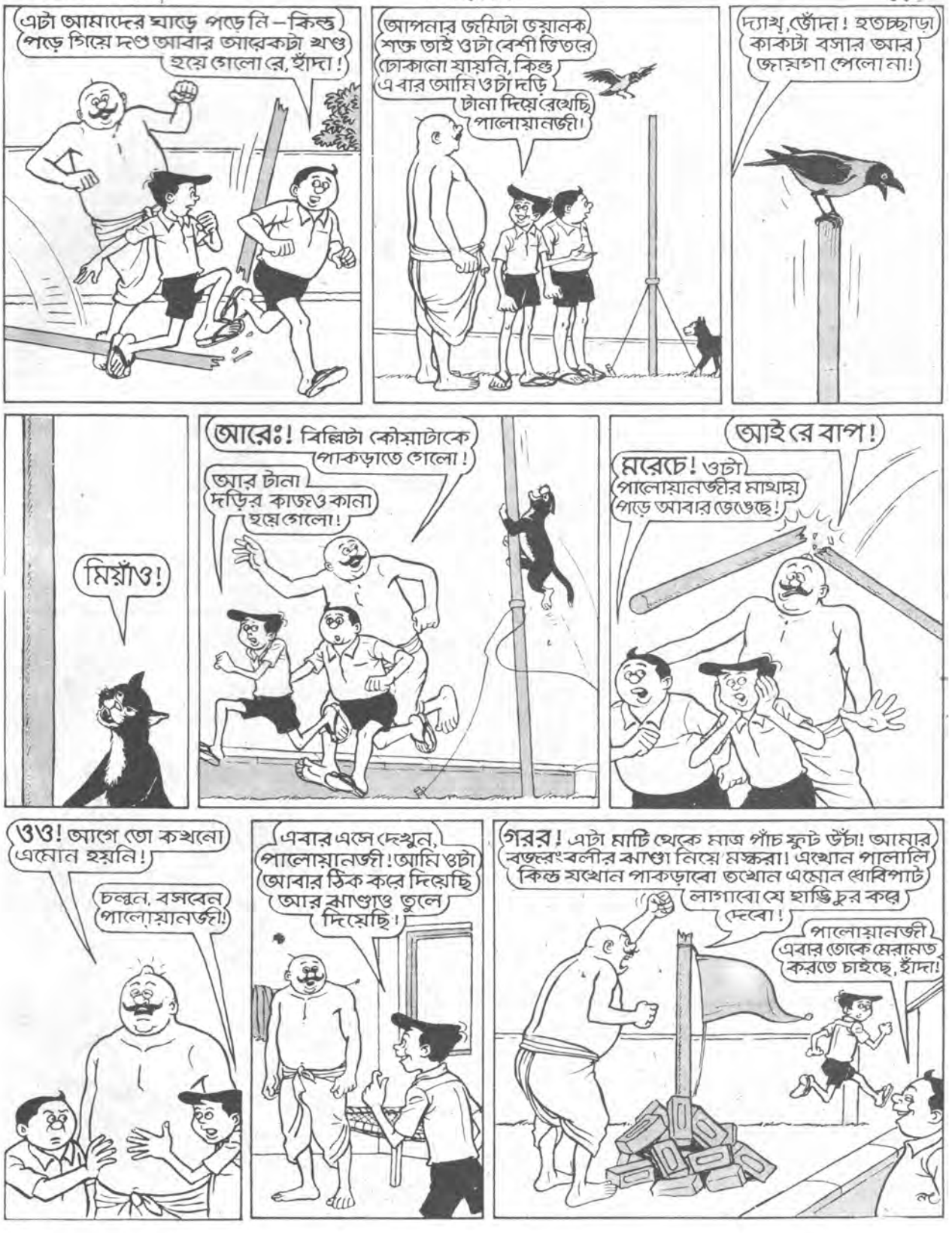

এটা আমাদের ঘাড়ে পড়েনি — কিন্তু পড়ে গিয়ে দণ্ড আবার আরেকটা খণ্ড হয়ে গেলো রে, হাঁদা!
আপনার জমিটা ভয়ানক শক্ত তাই ওটা বেশী ভিতরে ঢোকানো যায়নি, কিন্তু এ বার আমি ওটা দড়ি টানা দিয়ে রেখেছি পালোয়ানজী।
দ্যাখ্, ভোঁদা! হতচ্ছাড়া কাকটা বসার আর জায়গা পেলো না!
মিয়াঁও!
আরেঃ! বিল্লিটা কৌয়াটাকে পাকড়াতে গেলো!
আর টানা দড়ির কাজও কানা হয়ে গেলো!
আই রে বাপ!
মরেচে! ওটা পালোয়ানজীর মাথায় পড়ে আবার ভেঙেছে!
ওও! আগে তো কখনো এমোন হয়নি!
চলুন, বসবেন পালোয়ানজী!
এবার এসে দেখুন, পালোয়ানজী! আমি ওটা আবার ঠিক করে দিয়েছি আর ঝাণ্ডাও তুলে দিয়েছি।
গরর! এটা মাটি থেকে মাত্র পাঁচ ফুট উঁচা! আমার বজরংবলীর ঝাণ্ডা নিয়ে মস্করা! এখোন পালালি কিন্তু যখোন পাকড়াবো তখোন এমোন ধোবিপাট লাগাবো যে হাড্ডি চুর করে দেবো!
পালোয়ানজী এবার তোকে মেরামত করতে চাইছে, হাঁদা!

বীর বাঙালী

নির্বাসিত রাজকুমার বিজয় সিংহ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

নীল সমুদ্রের বুকে পাল তুলে ভেসে চলেছে তিনটি জাহাজ। সে সব জাহাজের আকারই শুধু বড় নয়, সুন্দর কারুকাজ করা, দূর যাত্রার জন্য ঠিক মতো সাজান, দেখলেই বোঝা যায় জাহাজগুলো কোনো ধনী শ্রেষ্ঠীর, নয়ত বা কোনো রাজপুরুষের।

সামনের সিংহমুখী জাহাজের উঁচু পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এক বলিষ্ঠ যুবক। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। মাথার চুল রুক্ষ। পরনে ধুতি, তা লাল কোমরবন্ধে বাঁধা। আদুড় গা, গলায় সোনার হার। কানেও সোনার মাকড়ী। যুবকের চোখের চাহনি যেন তীরের মতো। নাম এর বিজয় সিংহ।

বিজয় আনমনে তাকিয়েছিল দিকচক্রবালের দিকে। মনে তার গভীর চিন্তা। বেশ কয়েক দিন হলো সাতশ সংগী আর তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর ছেড়েছে সে। চলে যেতে হচ্ছে তাকে চিরকালের মতো জন্মভূমি ছেড়ে অনির্দিষ্টের উদ্দেশে।

রাঢ় দেশের রাজার বড় ছেলে সে। কিন্তু রাজা সিংহবাহু তাকে নির্বাসনদন্ড দিয়েছেন। দোষ তারই। ছেলেবেলা থেকেই সে ভীষণ একগুঁয়ে, দুরন্ত, স্বেচ্ছাচারী। মা-বাবার কথা পর্যন্ত শুনত না। তার অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কোনোভাবেই তাকে শাসন করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত নির্বাসনদন্ডই দিলেন রাজা।

চলে যাবার আগে বিজয় যখন তার মার সংগে দেখা করতে গিয়েছিল, মা বলেছিলেন, এই রাজ্যে কেউ তোমাকে চায় না। তোমাকে এখন নিজের ক্ষমতায় নিজের জন্য জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল বিজয়, তাই করবে ও, বিশাল এই পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে সে তৈরি করবে নিজের উপনিবেশ। ছলে, বলে, কৌশলে যে ভাবেই হোক এ তাকে করতেই হবে। তাই তো এই সমুদ্রযাত্রায় বার হয়ে পড়েছে বিজয় কোনো কিছু গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে। কেউ বাধা দেয়নি তার যাত্রাকালে। হয়তো সবাই মনে মনে খুশিই হয়েছে।

নির্বাসিত রাজকুমারের বহর সমুদ্রের বুকে হাওয়ায় পাল তুলে ভেসে চলেছে। সামনে কোনো দ্বীপ বা তটরেখা চোখে পড়ছে না। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে, আরও একটা দিন শেষ হলো। আসছে রাত্রি। সেদিকে তাকিয়ে বিজয় ডাকল, নকুড়, নকুড়।

নকুড় সর্দার সামনে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায়। নকুড় জাহাজের সবথেকে দক্ষ নাবিক। সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ। ওর উপরেই বেশি ভরসা করে বিজয় সিংহ।

–বহর ঠিক পথেই চলেছে তো? বিজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করল।

–আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজকুমার। আমরা চলেছি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। সে দিকেই দ্বীপপুঞ্জ। কোনো কোনোটা জনমানবশূন্য। দ্বীপগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ অঢেল। সেখানেই কোনো এক দ্বীপে আমরা নতুন উপনিবেশ স্থাপন করব।

বিজয় সিংহ বলল, দ্বীপে জনমানব থাকলেও ক্ষতি নেই। যুদ্ধ করে সে দ্বীপ আমরা দখল করব। যুদ্ধে বিজয় সিংহ ভয় পায় না। আমাদের প্রয়োজন বিশাল এক দ্বীপ।

এই কথার উত্তর দেয় না নকুড়। রাজকুমার যে কোন প্রকৃতির তা তো সে জানে।

বিজয় সিংহ নকুড়কে যেতে বলে ফের ভাবতে লাগল, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কি কোথাও কোনো ডাঙা দেখতে পাবে না বহর!

পরদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঈশান কোণে এক টুকরো মেঘ দেখা গেল। দেখতে দেখতে সে মেঘ ছড়িয়ে পড়ল। বাড়লো বাতাসের বেগ। বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয়ে গেল প্রলয়ঝঞ্ঝা। নাবিকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আপন আপন জাহাজ বাঁচাবার চেষ্টায়। ঝড়ের বেগে বহরের এক একখানা জাহাজ এক একদিকে ভেসে গেল। কোন জাহাজ যে কোন দিকে গেল কে জানে!

একসময় থামল ঝড়বৃষ্টি। আকাশ পরিষ্কার হলো। কিন্তু কোথায় অন্য সব জাহাজ! বিজয় সিংহ দেখল সীমাহীন সমুদ্রের বুকে একমাত্র তার জাহাজই ভাসছে। অন্য আর সব জাহাজ কোথায়! ঝড়ের বেগে তারা কি দিক হারিয়েছে, না কি অন্য কিছু ঘটেছে তাদের ভাগ্যে। দুঃখের কালো ছায়া নেমে এল বিজয় সিংহের মনের গভীরে।

কিন্তু দুঃখ করেই বা কি লাভ! যারা গেছে, তারা তো আর ফিরবে না। বিচ্ছেদের দুঃখ পিছনে ফেলেই তো দেশ ছেড়েছে তারা। আবারও নয় তেমনি করেই পিছনে ফেলে যাবে এই নতুন বিচ্ছেদের দুঃখ।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই বিজয় সিংহের চোখে পড়ল সামনে দূরে তটরেখা দেখা যাচ্ছে।

আপনজনদের হারানোর ব্যথা মনে নিয়েই বিজয় সিংহ জাহাজ ভেড়াল সেই তীরে। নামল নিচে। কিন্তু জায়গাটা ভাল লাগল না তার। উপনিবেশ গড়ার মতো নয় জায়গাটা। তাই আবার জাহাজ ভাসাল সে। এবারে চলল সমুদ্র উপকূল ধরে এগিয়ে।

বিজয় সিংহ রাজপুত্র। রাজার মতোই যদি না বাঁচতে পারে তো কিসের বাঁচা, তাই উপযুক্ত পরিবেশে জমি চাই তার। যতক্ষণ পর্যন্ত তেমন জমি না পাচ্ছে, তটরেখা ধরে জাহাজ নিয়ে এগিয়েই চলবে।

এমনি ভাবেই কেটে গেল আরও কদিন। হঠাৎ একদিন সকালে নাবিকরা সবাই চমকে উঠল একটানা পাখির ডাকে। এক ঝাঁক পাখি জাহাজের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল নাবিকরা, ডাঙা....ডাঙা!

দিকচক্রবালে দেখা গেল গাছের সারি। পাখিরা উড়ে চলেছে সেই দিকে। বিজয় সিংহের জাহাজও অনুসরণ করল পাখিদের।

পিঠে তূণ বেঁধে হাতে ধনুক তুলে নিয়ে তাতে জ্যা লাগিয়ে ভীষণ টঙ্কার দিল বিজয় সিংহ। ডেকে বলল, নাবিক, সৈনিক, তোমরা প্রস্তুত হও। সময় হয়েছে শক্তি পরীক্ষা দেবার। সামনে আমাদের যে দেশই হোক না কেন, ওই দেশ আমাদের অধিকার করতেই হবে। যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে।

দ্বীপের নাম তাম্রপর্ণী। অনেকে বলে, লঙ্কা।

বিজয় সিংহ যা ভেবেছিল তা কিন্তু সহজে হলো না। জাহাজ তীরে ভিড়তেই একদল কালো অস্ত্রধারী মানুষ ওদের ঘিরে ফেলল। তারা আক্রমণ করাতেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। তবে লঙ্কার সেনাবাহিনী তেমন দক্ষ যোদ্ধা নয়। তা না হলেও তারা সংখ্যায় অনেক। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে, সকলেই মারা পড়বে। তাই ধরা দেওয়াই উচিত মনে করল বিজয় সিংহ।

তাদের বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো রাজদরবারে।

তাম্রপর্ণীর রাজা যক্ষরাজ মহাকাম সেন। রাজসভায় বসে আছেন তিনি সিংহাসনে। পাশেই তাঁর বসে আছে কন্যা কুবেনী। রাজা তাকে খুবই স্নেহ করেন।

রাজার সামনে আনা হলো বন্দী বিজয় সিংহকে। তার সুন্দর রূপ দেখেই মুগ্ধ হলো রাজকন্যা কুবেনী। তার অনুরোধে যক্ষরাজ মুক্তি দিলেন বিজয় সিংহকে। শুধু কি তাই, রাজকন্যার অনুরোধে বিজয় সিংহকে আশ্রয় দিলেন আপন প্রাসাদে। সঙ্গে আসা নাবিক সৈন্যদেরও জমি দেওয়া হলো নতুন বসতি গড়ার জন্য।

স্বদেশ থেকে নির্বাসিত রাজকুমার নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে যে উপনিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিল, এতদিনে তার সে স্বপ্ন সার্থক করার সুযোগ এলো।

রাজকুমারীর সাহায্যে বিজয় সিংহ লঙ্কা-বাহিনীর ওপর ক্রমে ক্রমে নিজের প্রভাব বাড়িয়ে চলল। লঙ্কার বৃদ্ধ রাজা বিজয় সিংহের অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন বিজয় সিংহ সেনাবাহিনীকে উন্নততর যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছে। উন্নত সেনাবাহিনী তো তাঁরই শক্তি বাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু বিজয় সিংহের অভিসন্ধি অন্য। সে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেই এ কাজ করছিল।

লঙ্কার অন্য এক রাজকন্যা পোলামিডার বিয়ের রাতেই হঠাৎ আক্রমণ করে বিজয় সিংহ রাজপ্রাসাদ দখল করে নিল। তারপর অনুগত সৈন্যদের সাহায্যে গোটা লঙ্কাই দখল করে নিল। তার কূটবুদ্ধি, যুদ্ধবিদ্যার কাছে সবাইকেই হার মানতে হলো।

এ কাজে তাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল রাজকন্যা কুবেনী। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেই বিজয় সিংহ ভুলে গেল তাকে।

দেশ জয় করেই বিজয় সিংহ দেশের নাম বদলে রাখল সিংহল। আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিল সে। তার রাজত্বকালে রাঢ় থেকে বহু বাঙালী সিংহলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। সে কারণেই তাদের ভাষার মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে রাঢ় বঙ্গের বহু শব্দ।

বিজয় সিংহের পর তার ভাইয়ের ছেলে পান্ডু বাসুদেব সিংহলের রাজা হলো। তার সময়েও রাঢ় বঙ্গ থেকে বহু বাঙালী গিয়ে সিংহলে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করে। দুই দেশের মধ্যে তখন সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল।

ছবি: সুফি

নতুন ধাঁধা

১. পশুর আগে পা
পা বাদে রাস্তায় ঘোরে তা।
–অনীতা, সিদ্ধার্থ ও ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
অর্ধগ্রাম/বাঁকুড়া

২. দুইয়ে মিলে ভূগর্ভে রয়
উল্টে দিলে জননী হয়।
–মনসুর আহম্মদ
পলাশী/বীরভূম

৩. রাজার মাথার মাথায় দানব
মিষ্টি বানায় কোন্ সে মানব?
–বিভাংশু দত্ত
পল্লীশ্রী/আরামবাগ
হুগলী

৪. কহেন কবি কালিদাস
পথ চলার কালে
তেল নেই পলতে নেই
প্রদীপ তবু জ্বলে।
–গৌতম ঘোষ
কাশীরাম হাইস্কুল
দুর্গাপুর/বর্ধমান

*** কার্তিক সংখ্যার ধাঁধার উত্তর :–**
১ বানর ২ ঘড়ি [illegible] কলম ৪ কয়লা

*** কার্তিক সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর :–**

পাশাপাশি
(ক) ১৮১৬ সাল (গ) ১৯১১ সাল (ঙ) ১৮২৯ সাল
(চ) ১৮30 সাল (ছ) ১৯১0 সাল (ঝ) ১৯১৩ সাল
(ট) ১৯0৫ সাল (ঠ) ১৮৮৭ সাল

ওপর নিচ
(ক) ১৬১৬ সাল (খ) ১৮২৮ সাল (গ) ১৯১৯ সাল
(ঘ) ১৮৩৩ সাল (ছ) ১৯১৫ সাল (জ) ১৯0২ সাল
(ঝ) ১৯১৪ সাল (ঞ) ১৯৮৩ সাল

আষাঢ় সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥

পুষ্কর মল্লিক/ আমহার্স্ট রো; মধুরিমা ভট্টাচার্য/নন্দনা পার্ক, বেহালা; মৈনাক, টুপসু ও মামন সরকার/রিজেন্ট পার্ক, রানীকুঠী; বাণী, দীপু, ময়না ও সেবক রায়চৌধুরী/সন্তোষপুর, যাদবপুর পিউ, দীপালী, রিয়া ও টিয়া মুখোপাধ্যায়/আশুতোষ মুখার্জী রোড

॥ হাওড়া ॥

দ্বৈপায়ন, তুলসি ও বলরাম সামন্ত/ডোমজুড়; দেবু, নীপু, সিদ্ধার্থ ও চয়ন দত্তগুপ্ত/কদমতলা তিনকড়ি সাঁপুই/রামরাজাতলা;

॥ ২৪-পরগনা ॥

পিন্টু, জয়, মিন্টু ও শ্যামলী কর্মকার/অমরাবতী; সাধন, তপন, ভুবন ও নিতিন ব্যানার্জী/নিউ ব্যারাকপুর মায়া সরকার/শ্যামনগর; চৈতালী ও মিতালী দাশ/মনিরামপুর, ব্যারাকপুর

॥ মেদিনীপুর ॥

বিভাস সর্দার ও তুলসীব্রত লাহিড়ী/তমলুক; জনার্দন হালদার ও টুকাই সামন্ত/ঘাঁটাল রূপেন, গিরিন ও মুকুল চৌধুরী/লোয়ারদা; রজনী, তাপসী ও জয়া মন্ডল/চন্দনপুর পাটনা সৈকত, তনুশ্রী ও সোমু ব্যানার্জী/আস্তাড়া, তমলুক

॥ বর্ধমান ॥

শ্যামল, অমল, দূর্বা ও রীতা ভাওয়াল/গুসকড়া বিতান চক্রবর্তী/বর্ধমান শহর; দেবনাথ, অমরনাথ ও শীলা ঘোষ রায়/ছোটনীলপুর বুবুন, শান্তি, তমাল, বিজয়া, মৌটুসী ও তিতলি গঙ্গোপাধ্যায়/বিবেকানন্দ রোড, দুর্গাপুর

॥ বাঁকুড়া ॥

নয়ন, পরিমল, রবি ও তোতন/স্কুলডাঙা রোড; সুনীল ও পবন সামন্ত/উখরা;

॥ বীরভূম ॥

ছন্দা, টুকু, মুন্নি ও অনীতা সোম/বোলপুর; বীথি, নয়না, সুব্রত, রাজীব ও প্রিয়া/দুবরাজপুর;

শ্রাবণ সংখার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥

পাবলি, টাবলি, লাভলি, রাজা, যীশু, গোগল, জয় ও রুমকি/বিজয়গড়, কলকাতা;

বাবুন, ফুচি, বোনা, মাম, রাজা, পম্পু ও ভোঁদহি/বৃন্দাবন ঘোষ লেন; বাণী, বিশু, বাবান, গৌতম ও বাবলা/সাউথ এন্ড পার্ক; অরুণিমা মন্ডল/শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা; ঝুনি, কুণাল ও মৃণাল চক্রবর্তী/কোল ইন্ডিয়া কমপ্লেকস্, বাঘাযতীন; সুমন ও রঞ্জন ভট্টাচার্য/নন্দনা পার্ক, বেহালা;

|| হাওড়া ||

দোলা, মায়া ও রুমা ব্যানার্জী/অনন্তদেব মুখার্জী লেন, শিবপুর; হিল্লোল, পরিবেশ ও সুনিবেশ/ জোয়ারগোড়ী; অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা, অননা, ডায়না, আকাশ ও অরিন্দম/সদর বক্সী লেন; আনন্দ, চন্দ্রশেখর ও নতুন মান্না/বাজেশিবপুর রোড; জয়দেব, শুভাশিস, দেবাশিস, পুষ্পরাণী, সর্বাণী ও সুতন্বী ভট্টাচার্য/কৈলাশচন্দ্র লেন; অতনু মন্ডল/উলুবেড়িয়া; শুভদীপ মুখার্জী/আন্দুল, দক্ষিণ পাড়া নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্ত/বারুইপাড়া, ডোমজুড়;

|| ২৪-পরগনা ||

সোমা, তনিমা, তন্ময় ও বুড়ো দত্ত/কালীতলা, শিবরামপুর জয়, পিকুন ও নমিতা বিশ্বাস/ উমুমপুর, আগরপাড়া; মিনতি, শিশির, নুপুর, পীযূষ, নিবেদিতা ও সুকন্যা তপস্বী/বোড়াল, মাঝেরপাড়া;

|| হুগলী ||

দেবাশিস ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/শ্রীরামপুর, এল এম ভট্টাচার্য স্ট্রীট অয়নাংশু, ডরোথি, আপ্পী ও বিভাসিতা দত্ত/পল্লীশ্রী, আরামবাগ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী/গ্রাম-পোঃ বেলমুড়ি; সৈকত, ডল, তুতুন, সোমক ও লিলি চট্টোপাধ্যায়/ঠাকুর বাটী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর;

|| বর্ধমান ||

সৈকত, পিউলি ও সঞ্জীবকুমার /গ্রাম-পোঃ অমরাবগড় সুমেধা, ঋতুপর্ণ, সুশ্রেবতা, দেবশ্রুতি ও পামেলা/বার্ণপুর সংগীতা, সুজাতা ও সুলতা/চিত্তরঞ্জন

|| মেদিনীপুর ||

প্রতীপ, পাপিয়া, অয়ন ও সৌমা মন্ডল/নিউ ডেভেলপমেন্ট, খড়্গপুর সুদর্শন, শ্রীলেখা, মণিকা, সৃষ্টি, স্বর্ণেন্দু ও সোমনাথ/গড়বেতা;

|| বাঁকুড়া ||

সঞ্জয় ও সোনালি পাল/প্রণবানন্দ পল্লী, কেন্দুয়াডিহি টুটু, চন্দন পিংকি মাম্পি, সোনা ও বুড়ো/বিষ্ণুপুর মিলটন, কল্লোল, মৌসুমী, অষ্টমী, পার্থ, বুবাই ও অন্যান্যরা/গ্রাম: মনোহর, মালিপাড়া

|| পুরুলিয়া ||

কৌশিক ও বৈশাখী চৌধুরী/পশুপতি নিকেতন

|| নদীয়া ||

চুনু দত্ত/মতীতোষ বিশ্বাস স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর শ্যামল দত্ত, আবেদ আলী/কাঠুরিয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর অনিমেষ, অভিরূপা ও পূর্ণিমা গোস্বামী/কৃষ্ণনগর

|| মুর্শিদাবাদ ||

মানিকচন্দ্র সেন/রঘুনাথগঞ্জ; মন্দিরা ও মধুরিমা মিত্র/মধুপুর রোড, বহরমপুর; অলকা, সুমন, সোমালী, শাওলী, বরুণা ও জয়ন্ত/নিমতলাপাড়া লেন, খাগড়া;

|| বীরভূম ||

মনসুর, আজিজুল, আফজল ও খোকন/পলাশী;

|| বিহার ||

ঋতুপর্ণা মুখার্জী/কাতরাসগড়, ধানবাদ; সুমন্ত, চৈতালী, হিরন্ময়, শক্তি ও অনিল চ্যাটার্জী/চন্দ্রপুরা, গিরিডি; সৌরেন ও শৌভিক ঘোষ রায়/মৌভান্ডার, সিংভূম; অনির্বাণ ও দেবানিকা ভট্টাচার্য/শ্যামলী কলোনী, রাঁচি;

|| উড়িষ্যা ||

সলিল, অঞ্জু, অমিত, নন্দিতা, জয়ন্ত, হরেন্দ্র ও সৌমা/কটক

|| আসাম ||

সুভাষ, চুমকি, সমিত, অমিত, নাড়ু গুলু ও টুকাই/বড়গাং, শোণিতপুর;

ভাদ্র সংখার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

|| কলকাতা ||

অভিষেক মিত্র/রূপচাঁদ মুখার্জী লেন; ঈশাণী, দোলা, সুমনা ও নয়না সরকার/টালীগঞ্জ রোড

|| হাওড়া ||

দোলা, মায়া, রুমা ও অন্যান্যরা/অনন্তদেব মুখার্জী লেন দেবকুমার, প্লাবন, হীরক ও বেচু খাঁ/কদমতলা

|| ২৪-পরগনা ||

নেদু, খোকা, বিজু, সজু ও বাসু আচার্য/উদ্ভি দেবাশিস, শুভাশিস ও শংকর ব্যানার্জী/বোড়াল বিনু, মল্লিকা ও মলয়া রায়/অমরাবতী

|| হুগলী ||

খুশী, লাবণী ও মিতা চৌধুরী/রেলগেট পাড়া, বৈদ্যবাটী বিশাখা, স্বপন ও কেয়া/শাওড়াফুলি

|| মেদিনীপুর ||

তপেন্দু, সূর্য, আলোক ও সরমা সামন্ত/দাঁতন বিশু, স্বপন, টিটু, লাখু ও বৈদ্য গড়াই/তমলুক

|| বর্ধমান ||

অমল ও নন্দন সমাজপতি/কার্জন গেট, বর্ধমান শহর তাপু, কালু, ওমর, আবিদ ও সুব্রত/কালনা রোড

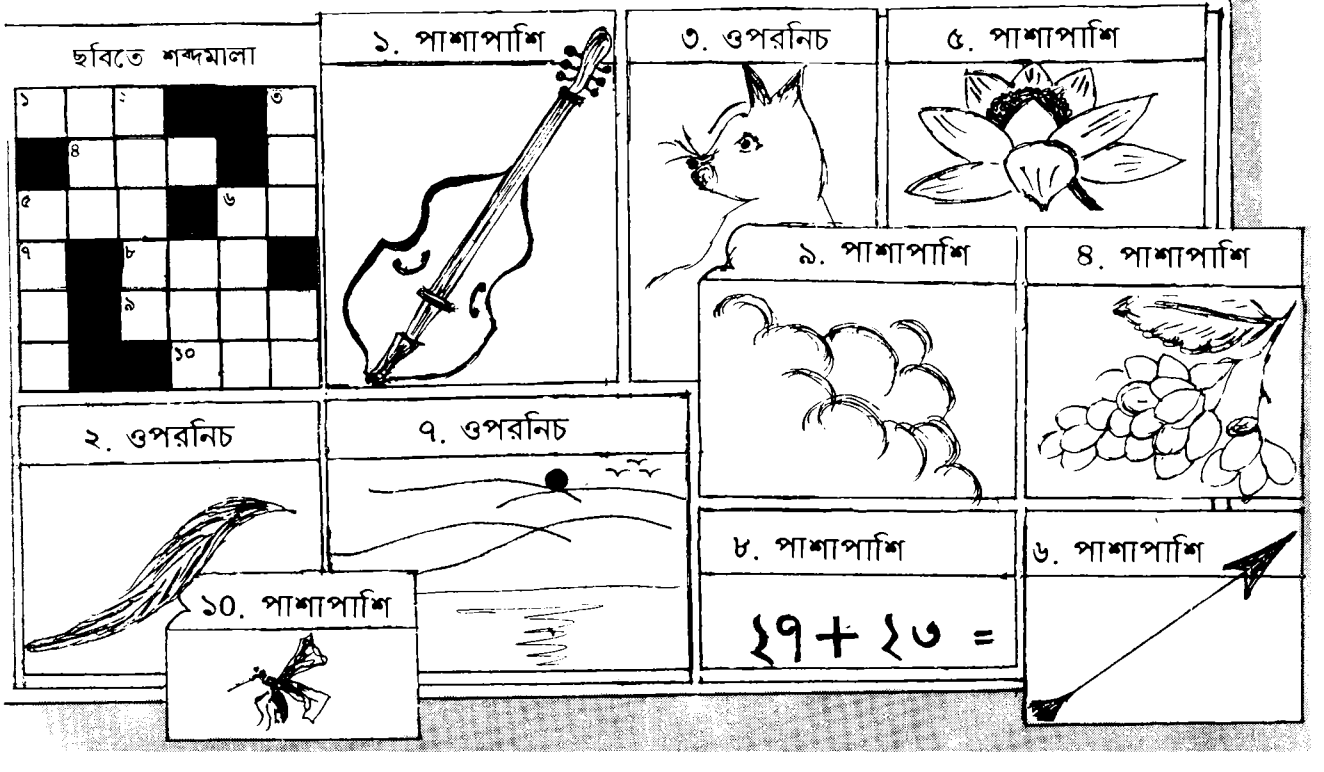

ত্রয়ীর অভিযান

পরাশর রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোট্টু অফিস ঘরে ফিরে এসে শেলী ও শান্তকে ফোনের ব্যাপারটা বলল। বটেশ্বরের সন্দেহের কথাও বলল। একটু হাসাহাসি হলো। শান্ত কিন্তু হাসল না। বলল–'মোট্টু, ভেবে দেখলাম ফো করে তুই ভুল করেছিস। কোনো পাকা ডিটেকটিভ এরকম ভুল করে না।'

–'কেন বল্ তো?' মোট্টু বলল।

–'দ্যাখ্, ফোনে ভজহরি ঘোষের নাম–সোনারপুরের নাম–মজিলপুরের নাম–এতসব বলে তুই উল্টে ভজহরি ঘোষকে সাবধান করে দিলি। ও জেনে গেল যে ওর সোনারপুরের ঠিকানা আর মজিলপুরের আস্তানা যেভাবেই হোক কেউ জেনে ফেলেছে। এতে ভজহরি ঘোষ সাবধান হয়ে যাবে।'

মোট্টু মাথা নিচু করে একটু ভাবল। মনে পড়ল, ও মজিলপুরের কথা বলতেই যে ফোন ধরেছিল সে আর একটি কথাও না বলে ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল। 'মিত্রবাড়ি' তো মজিলপুরেই। মোট্টু মুখ তুলে বলল–'শান্ত, তুই ঠিকই বলেছিস। ফোন করা আর ফোনে অত কথা বলাটা ঠিক হয়নি। ভজহরি ঘোষ হয়তো এখন মজিলপুরে ছুটে আসবে। 'মিত্রবাড়ির' আস্তানায় গোপন ঘরটা সুরক্ষিত আছে কিনা দেখতে আসবে।' মোট্টু একটু থেমে বলল–'এবার আমাদের কাজে নামতে হবে। 'মিত্রবাড়ি'র ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। ভজহরি এলে তাকেও নজরে রাখতে হবে। দেখতে হবে একটা ঘর অত সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? কী উদ্দেশ্য ভজহরি ঘোষের?'

–'দিনের বেলায় না হয় নজর রাখলাম'–শান্ত বলল–'কিন্তু রাতে?'

–'আমি রাতেও নজর রাখবো।' মোট্টু বলল।

–'রাতের অন্ধকারে ওরকম একটা ভুতুড়ে বাড়িতে একা

যেতে পারবি তুই?' শেলী বলল।

–'এখন শুক্লপক্ষ চলছে। চাঁদের আলো থাকবে।' মোটু বলল–'তাছাড়া দেখবি বাগানের কোণায় একটা ভাঙা ঘর আছে। হয়তো বাগানের মালী থাকতো। ওখানেই আস্তানা নিতে হবে।' শান্ত আর শেলী কোনো কথা বলতে পারল না। একা রাতের বেলা 'মিত্রবাড়ি'তে থাকা–ওরা এটা ভাবতেও বেশ ভয় পেল। মোটু এবার ওর সেই গর্বের ভঙ্গীতে বলতে লাগল–'জানিস ছোটবেলা থেকেই আমার ভীষণ সাহস। আমার তখন তিন সাড়ে তিন বছর বয়স। সেবার হয়েছে কি–' শান্ত গলা চড়িয়ে বলল–'থাম তুই।' মোটু আর কথাটা শেষ করতে পারল না। বেচারা!

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মোটু বলল– 'গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো কে বা কারা ঐ বাড়িতে আসে–থাকে।'

–'আচ্ছা এখন যাবি?' শেলী বলল।

–'না। আজকে নয়। সবে তো ভজহরি ঘোষের মনে সন্দেহ হয়েছে। ও নিশ্চয়ই কাল আসবে। কালকে যাবো আমরা।' শান্ত বলল।

–'আমার বেশ ভয় করছে।' শেলী বলল।

–'তাহলে আর জীবনেও সত্যসন্ধানী হতে পারবি না।' শান্ত বলল।

মোটু হেসে বলল–'আরে এ তো সবে শুরু। মৌচাকে ঢিল মেরেছি। এবার দ্যাখ্ না কী হয়।'- শান্ত উঠে দাঁড়াল–'চল্ বাড়ি যাই।' শেলী, মোটুও উঠে পড়ল।

সন্ধ্যের পর আকাশে মেঘ জমল। বৃষ্টি হলো কিছুক্ষণ। তারপরই আকাশ পরিষ্কার। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ দেখা গেল।

পরদিন সকালে তিন সত্যসন্ধানী অফিসঘরে এল। একটু পরেই অফিসঘরের তালা লাগিয়ে তিনজন 'মিত্রবাড়ি'র উদ্দেশে চলল।

যখন ওরা বাজারের রাস্তা ধরে যাচ্ছে তখনই বটেশ্বর ওদের দেখল। বটেশ্বর তখন একটা চায়ের দোকানে বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছিল। মোটুদের দেখেই ও ভাবল–যা ভেবেছি ঠিক তাই! ঐ বিচ্ছু তিনটে নিশ্চয়ই কোনো রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। আবার ওরা আমার আগেই রহস্যের সমাধান করবে? উঁহু। তা আমি হতে দেব না। বটেশ্বর চায়ের গ্লাস রেখে রাস্তায় এল। খুব সতর্কভাবে মোটুদের অনুসরণ করতে লাগল। বিচ্ছুগুলো কোথায় যায় দেখি!

বটেশ্বর রাস্তার ধারে দোকানগুলোর খুব কাছ দিয়ে হাঁটতে লাগল যাতে শান্তরা কেউ পেছনে তাকালেই ও দোকানে ঢুকে পড়তে পারে।

শান্তরা যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলতে বলতে।

এদিকে দোকানগুলোর ধার ঘেঁষে যেতে গিয়েই বটেশ্বরের প্ল্যান ভেস্তে গেল। একজন দোকানদার চেঁচিয়ে ডাকল–'বটেশ্বরদা, আসুন আসুন। কতদিন আসেন না।' কথাটা শান্তর কানে গেল। মোটু আর শেলী কথা বলছিল। কিন্তু ও চুপ করে হাঁটছিল। কাজেই ও কথাটা শুনতে পেল। ও চাপাস্বরে ডাকল–'মোটু।' মোটু ওর দিকে তাকাল। শান্ত ফিস্‌ফিস্ করে বলল–'পেছনে তাকাস না, বটেশ্বর আমাদের ফলো করছে।' কথাটা শুনে শেলীও আর পেছনে তাকাল না।

–'এখন কী করবি?' শেলী বলল।

–'বটেশ্বরকে অন্য জায়গায় চালান করে দিতে হবে।' শান্ত বলল।

–'কী করে?' মোটু বলল।

–'সামনে ঐ ক্ষীরোদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকবো আমরা।' শান্ত বলল।

তিনজনে দোকানটায় ঢুকল। বেঞ্চিতে বসল। শান্ত বলল–'তোর কলম ডায়েরী বের কর্।' মোটু সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরী কলম বের করল। শান্ত বলল–লেখ–শান্ত ও শেলী, ব্যাঙ্ক-ডাকাত-দলের হদিস আমি পেয়েছি। ওদের গোপন কথা আমি আড়ি পেতে শুনেছি। ওরা আজকে (মঙ্গলবার) তালডাঙায় যাবে। ডাকাতির টাকা ওখানে লুকিয়ে রাখবে। এ কথা কাউকে বলিস না।

ইতি
মোটু

লেখা হলে শান্ত বলল– 'এখান থেকে আমরা ডান দিকে ঘুরে 'মিত্রবাড়ি' যাওয়ার রাস্তা ধরবো। কিছুটা গেলেই একটা মোড় পড়বে। বাঁদিকে ডানদিকে দুটো রাস্তা গেছে। সোজা রাস্তাটা এঁকেবেঁকে মিত্তিরবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঐ মোড়ে তুই ডান দিকে যাবি, আমি বাঁ দিকে আর শেলী সোজা যাবে। ঠিক মোড়েই তুই এই চিঠিটা রাস্তায় আলগোছে ফেলে দিবি। তারপর দ্যাখ্ কী কান্ড হয়।' মোটু আর শেলী হেসে উঠল। শান্ত বলল– 'চুপ।' মোটু কাগজটা ডায়েরী থেকে ছিঁড়ে বুকপকেটে রাখল।

তিনজনে রাস্তায় এল। বটেশ্বর এতক্ষণ একটা মোটা জামগাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওদের হাঁটতে দেখে আবার পিছু পিছু চলল।

মোড়টা এল। মোটু বুকপকেট থেকে চিঠিটা আস্তে আস্তে বের করে দু পায়ের ফাঁক দিয়ে ফেলে দিল রাস্তায়। তারপর তিনজন তিন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

বটেশ্বর চিঠিটা পড়ে যেতে দেখল। ও একটু থমকাল। তখন তিনজন তিন দিকে চলেছে। বটেশ্বর সমস্যায় পড়ে গেল। কাকে ফলো করবে? তখন ও ভাবল আগে দেখা যাক ঐ কাগজটা কী? তারপর ভাবা যাবে।

ওরা বেশ কিছুটা চলে গেল। বটেশ্বর ছুটে এসে রাস্তা থেকে কাগজটা কুড়িয়ে নিয়েই পকেটে পুরল। তারপর একটা শিমুলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ল। ভাবল–ও, তাহলে আমি ঠিকই ধরেছিলাম। বিচ্ছুগুলো ব্যাঙ্ক-ডাকাতদলের পেছনে লেগে আছে। এবার তাহলে তালডাঙা যেতে হয়। আজকেই তো মঙ্গলবার। বটেশ্বর নিজের উর্দির দিকে কাল। উঁহু, এই পোশাকে ডাকাত ধরতে যাওয়া যাবে না। সাদা পোশাকে যেতে হবে। বটেশ্বর আর দাঁড়াল না। মোটুদের কাউকে ফলোও করল না। কোয়ার্টারে ফিরে চলল। ওদিকে মোটু একটা ঝোপের আড়াল থেকে বটেশ্বরের চিঠি পাওয়া, পড়া আর ফিরে যাওয়া দেখল।

একটু পরেই মোটু মোড়ে ফিরে এল। শান্ত আর শেলীও

এল। মোটু যা দেখেছে বলল। তিনজনে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় আর কী! তালডাঙা এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে। বটেশ্বর ডাকাত ধরবার জন্যে তালডাঙার মাঠে বসে আছে এ কথা ভাবতেই তিনজনের হাসি আরো বেড়ে গেল।

বটেশ্বর ফিরে আসছে। কালকে সন্ধ্যের পর মেঘ করে বৃষ্টি হয়েছে। তাতেই ঠান্ডা লেগেছে কিনা কে জানে! নাক দিয়ে জল পড়ছে আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই হাঁচি হচ্ছে। যদুর দোকানে এর মধ্যেই দু গ্লাস আদা-চা খেয়েছে। কিন্তু সর্দি কমার লক্ষণ নেই। পকেট থেকে রুমাল বের করে জোরে নাক ঝাড়ল–ফ্যাঁ–অ্যা–চ্।

যদুর দোকানে এল। আর এক গ্লাস আদা-চা দিতে বলল। চা খেতে খেতে ও যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল, ও একা তালডাঙায় ডাকাতের দলকে ধরেছে। থানায় হৈ হৈ পড়ে গেছে। ইন্সপেকটার রথীন মিত্র ওর পিঠ চাপড়াচ্ছেন। বলছেন– 'ঐ কাচ্চাবাচ্চাগুলো কি বুদ্ধিতে সাহসে তোমার ধারেকাছে আসে?' বটেশ্বর বাঁ হাতে নিজের গোঁফ চুমড়ে উঠে পড়ল। অনেক কাজ। দেরি করা চলবে না। বিচ্ছুগুলোর আগেই ডাকাত দলকে পাকড়াতে হবে। একটা জোর হাঁচি হেঁচে ও দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

দরজার নিচের অংশটা খুলে এল।

ওদিকে শান্ত, মোটু আর শেলী 'মিত্রবাড়ি'র দিকে চলল। ওরা পেছনে লক্ষ্য রাখছে। বলা যায় না–হয়তো বটেশ্বর আবার পিছু নিয়েছে। কিন্তু সারা রাস্তায় বটেশ্বরের টিকিও দেখতে পেল না ওরা।

'মিত্রবাড়ি'র সদর দরজা পার হয়ে ঢুকল ওরা। তখনই শান্ত দেখল–ভেজা মাটিতে জুতোর ছাপ। শান্ত বলে উঠল–'দ্যাখ্–দ্যাখ্ জুতোর ছাপ। কালকে বৃষ্টি হয়েছিল। জুতোর ছাপ পড়েছে।' ওরা দেখল–জুতোর ছাপ বাড়িটার দরজা পর্যন্ত গেছে। ফিরে আসার উল্টোমুখী ছাপও রয়েছে। এবার শেলী বলল–'গেট-এর বাইরে মোটর গাড়ির চাকার দাগ দেখেছি। তখন ওটা নিয়ে ভাবিনি।'

মোটু শেলী ছুটে গেট-এর কাছে এল। সত্যিই গাড়ির চাকার দাগ মাটিতে। দাগগুলো পরস্পর মিলেমিশে গেছে। বোঝা গেল যে এসেছিল সে গাড়ি চড়ে এসেছিল। আবার গাড়িতেই ফিরে গেছে। মোটু চাকার দাগ দেখতে দেখতে বলল–'দ্যাখ্ শান্ত, আমরা কত কম জানি। পাকা ডিটেকটিভ হলে ঠিক বলে দিত দাগটা সাধারণ মোটর গাড়ির না জীপের না ট্রাকের। যাক গে, চল্ ভেতরে।'

তিনজনে আবার গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকল। শান্ত বলল–'এ নিশ্চয়ই ভজহরি ঘোষ। তোর ফোন পেয়ে ছুটে চলে এসেছে। দেখতে এসেছে ওর গোপন ঘর ঠিক আছে কিনা।'

–'হতে পারে। বলেছিলাম না মৌচাকে ঢিল মেরেছি।' মোটু বলল। শেলী বলল–'এখন চল্ গাছে উঠে সেই গোপন ঘরটা দেখি গে। ঘরের জিনিসপত্র দেখলেই বোঝা যাবে কেউ এসেছিল কিনা।

–'চল।' মোটু বলল।

মোটু প্রথমে শেলীকে গাছে উঠতে সাহায্য করল। শেলী উঠলে ওরা দুজনেই উঠল। ডাল ধরে ধরে মোটু আর শান্ত মগডালের কাছে উঠে এল। শেলী কিছুটা নিচে একটা ডাল ধরে দাঁড়াল। তিনজনেই দেখল ঘরটা ঠিক আগের মতো সাজানো নেই।

–'দ্যাখ্ একটা স্টোভ রয়েছে। তাতে একটা কেটলি

চাপানো, শান্ত বলল। মোটু বলল–'জালঘেরা মিটসেফটার ওপর দ্যাখ্ কয়েকটা থালা বাটি গ্লাস।' শেলী বলল–'ঘরটা কিন্তু ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে। কী ব্যাপার বল তো?' মোটু বলল–'আমার মনে হচ্ছে বিশেষ কেউ আসবে বলে ঘরটায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কে সে? নিশ্চয়ই ভজহরি ঘোষ।' শান্ত বলল–'নেমে চল্। বেশিক্ষণ এখানে থাকা–

তিনজনেই তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল। শেলী বলল–'আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে এখুনি বাড়িটার মধ্যে ঢুকে সব দেখতে।'

'দাঁড়া–বাড়িটায় ঢোকার একটা উপায় বার করতেই হবে।' মোটু বলল।

এবার ওরা বাড়িটার চারপাশ খুব করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বাড়িটার পশ্চিম কোণায় এসে দেখল–এখানেও একটা দরজা রয়েছে। তবে ঝোপজঙ্গলে দরজাটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মোটু ঐ দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দরজাটা ভালো করে দেখবে বলে জংলা গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে এগোল। কয়েক পা এগোতেই দেখল জংলা গাছের একটা ডাল ভেঙে ঝুলছে। তারপরেই আর একটা জংলা গাছের ডাল একেবারেই ভাঙা। মোটু চমকে উঠল। একটা চিন্তা মাথায় পাক খেয়ে গেল–নিশ্চয়ই এখান দিয়ে কেউ ঢুকেছিল। কিন্তু কেন? মোটু তাড়াতাড়ি দরজার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দেখল দরজায় ওঠার তিনটি সিঁড়ির একটাতে এক চাপড়া মাটি। আশ্চর্য! সেই মাটিতে জুতোর গোড়ালির স্পষ্ট ছাপ। মোটু ভাবল–তাহলে গতকাল রাতে বৃষ্টির পর জুতো পায়ে এই জংলা গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে কেউ এখানে এসেছে। বাগানের কাদামাটি ওর জুতোর তলায় চাপড়া হয়ে লেগেছিল। তারই কিছুটা সিঁড়িতে আটকে আছে জুতোর গোড়ালির কিছুটা ছাপসুদ্ধ। মোটু চাপাস্বরে ডাকল–'শান্ত, এদিকে আয়।' শান্ত জংলা গাছ ঠেলে এল। মোটু ততক্ষণে জুতোর গোড়ালির ছাপসুদ্ধ মাটির চাপড়াটা সিঁড়ি থেকে আলগোছে তুলে ফেলেছে। সেটা সাবধানে শান্তর হাতে দিয়ে বলল–'গেট-এর কাছে যে জুতোর ছাপ আমরা পেয়েছি মিলিয়ে দেখে আয় একই জুতোর ছাপ কিনা।' শান্ত সন্তর্পণে চলে গেল ছাপ মেলাতে। একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এসে বলল–'মোটু, একই জুতোর ছাপ।'

–'হুঁ।' মোটু মুখে শব্দ করল। বলল–'কাল রাতে যে লোকটা এই বাড়িতে এসেছিল সে এই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেন?'

শান্ত বলল–'দ্যাখ্ মোটু, আমার মনে হয় এই বাড়িতে যে বা যারা আসে তারা মোটেও ভালো লোক নয়। তোর ফোন পেয়ে ওরা বুঝে গেছে যে ওদের গোপন আস্তানার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। এবার কোনোরকম হামলা হলে অথবা পুলিশ যদি তল্লাশীতে আসে তাহলে ওদের পালাতে হবে। হয়তো সেই পালাবার রাস্তা ঠিক করে জানতেই কালকে রাতে লোকটা এসেছিল।'

–'সাবাস্ শান্ত, ঠিক বলেছিস।' মোটু বলল–'আমার মনে হয় এখানেই কোনো গোপন দরজা আছে। কারণ এই জায়গাটায় জংলা গাছ বেশি আর এই সিঁড়িতেই ঐ লোকটা কাল এসে দাঁড়িয়েছিল।'

এবার মোটু দরজাটা ভালো করে দেখতে লাগল। শান্ত চাপাস্বরে ডাকল–'শেলী।' শেলীও জংলা গাছগুলোর ওপাশ থেকে চাপা গলায় বলল–'বল্।'

–'তুই চারদিকে নজর রাখ্। কাউকে আসতে দেখলে পাখির ডাক ডাকবি, শান্ত বলল। শেলী মুখ দিয়ে প্লেন ওড়া নামা, রেলইঞ্জিনের ভোঁ, পাখির ডাক, বেড়ালের ঝগড়া এসব শব্দ করতে পারে।

মোটু এর মধ্যেই লক্ষ্য করল–ডান দরজার কাঠের গায়ে একটা ছোট কড়া লাগানো। কড়াটা লোহার। কালো, কিন্তু জং ধরেনি। অথচ দরজাটার মাঝামাঝি দুটো বড় লোহার কড়াতেই জং ধরার দাগ। তাহলে এই ছোট কড়াটা অনেক পরে লাগানো হয়েছে। মোটু, ছোট কড়াটা যেখানে দরজার কাঠে লাগানো হয়েছে সে জায়গাটা দেখতে গিয়ে চমকে উঠল। এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঠটায় একটু চল্কা ওঠা। তার মানে কড়াটা কয়েকদিন আগে লাগানো হয়েছে। তারপরই মোটু ভাবল–কয়েকদিন আগে কেন? কড়াটা কালকে রাতে লাগানো হয়েছে আর সেই লোকটা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কড়াটা লাগিয়েছে। প্রশ্ন হলো– কেন? মোটু ছোট কড়াটায় আঙুল ঠেকাল। তারপর একটু টানল। দরজার নিচেটা নড়ছে। মোটু জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। দরজার নিচের অংশটা খুলে এল। দেখা গেল ওখান দিয়ে চৌকোনো ফোকর। খুব সহজেই একজন প্রমাণ সাইজের মানুষ ঢুকতে বেরোতে পারে। শান্ত তো ঐ ফোকর দেখে অবাক। মোটু বলল–'বুঝলি শান্ত, এই কড়াটা কাল রাতে লাগানো হয়েছে। ভজহরি ঘোষ সাবধান হয়ে গেছে। ওরা এখন থেকে আর সদর দরজা দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকবে না। ঢুকবে এই গোপন দরজা দিয়ে। বিপদে পড়লে পালাবেও এখান দিয়ে।'

মোটু ফোকরটায় মাথা গলাল। দেখল অন্ধকার। বাইরের চড়া রোদ থেকে ভেতরে মাথা ঢুকিয়েছে। কিছুক্ষণ কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসতে দেখল একটা বড় ঘর। ঘরটায় রাজ্যের ভাঙা টেবিল চেয়ার আলমারি, পুরোনো আমলের কাচভাঙা ড্রেসিং টেবিল স্তূপাকার হয়ে আছে।

মোটু মাথা সরিয়ে আনল। শান্ত বলল–'মোটু, আমরা অনেকক্ষণ এখানে আছি। আর থাকা ঠিক নয়। চলে আয়।'

মোটু কাটা দরজাটা খাপে খাপে বসিয়ে দিল। একটা আস্ত দরজার মতোই দেখতে লাগল। মোটু শান্তকে বলল–'চল্।' ওরা দুজনে জংলা গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর শেলীকে সঙ্গে নিয়ে ওরা দুজন দ্রুত 'মিত্রবাড়ি'র বাইরে বেরিয়ে এল। ফিরে আসার সময় রাস্তায় কেউ কোনো কথা বলল না।

(চলবে)

ছবি : বিজন কর্মকার

গল্প

জাহাঙ্গীরের ছুরি

সঞ্জয়কুমার ভুঁইয়া

'তাহলে এটাই নিচ্ছেন স্যার?' একটা বাদশাহী আমলের ছুরি এগিয়ে দিয়ে সামনে বসা ভদ্রলোকের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন গোবিন্দবাবু।

মাঝবয়সী চেহারার ভদ্রলোক। কাঁচাপাকা চুল। পরনে কুচকুচে কালো রঙের দামী কোট প্যান্ট। চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। মাথায় পুরনো আমলের একটা ইংলিশ হ্যাট। থেকে থেকে দু আঙুলের ফাঁকে ধরা বাঁকানো কাঠের পাইপটা একবার করে টেনে নিচ্ছিলেন।

এ হেন একজন সাহেব ব্যক্তি যে গোবিন্দ সাঁতরার পলেস্তারা খসা, বহুকালের পুরনো কিউরিওর দোকানে এসে জিনিসপত্রের দাম করছেন এটা তার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার বৈকি। ঠাকুর্দার আমলের দোকান। বাবাও দেখাশোনা করেছেন। সেই ঠাকুর্দার আমলেই দেওয়ালে প্রথম ও শেষবারের মতো রঙ পড়েছিল। ধুলোপড়া ভাঙা কাচের শোকেসগুলোও সেই সময়কার। এর মধ্যেই গোটাকতক ঐতিহাসিক জিনিসপত্র নিয়ে গোবিন্দবাবুর কারবার।

অবশ্য এ দোকানের কটা জিনিস যে ঐতিহাসিক সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই দারুণ বিদ্যেটা তিনি শিখেছিলেন বাবার কাছে। দাদুর আমলে দোকান রমরম করেই চলত। সেরকমই শুনেছেন। তখন নাকি অনেক নামী-দামী লোকের আনাগোনা ছিল দোকানে। এখন চল্লিশ পাওয়ারের একটা টিমটিমে বাতি জ্বেলে গোবিন্দবাবু বসে থাকতে থাকতে শেষ অবধি ঘুমিয়ে পড়েন। সপ্তাহ-শেষে আঙুলের কর ধরে খদ্দেরের সংখ্যা গোনেন আর উড পেনসিলের পেছনটা চিবোতে চিবোতে লাভের হিসেবটা খতিয়ে দেখেন।

গোবিন্দবাবুর দোকানে যত না খদ্দের আসে তার চেয়ে বেশি আনাগোনা করে তাঁর আড্ডাবাজ বন্ধুরা। তাঁর নিজেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ। গত তিন দিন ধরে দোকানে কোনো খদ্দেরের পায়ের ধুলো পড়েনি। তাই হঠাৎ এক দেশী সাহেবের উপস্থিতিতে তাঁর মনটা আনন্দে নেচে উঠল।

–'নিয়ে যান স্যার, খোদ আকবরের আমলের জিনিস। এমন জিনিস একবার মিস্ করলে আর হয়তো পাবেন না।' কালো বাঁটের ওপর সাপের জিভের মতো বেঁকানো ফলাযুক্ত ছুরিটার দিকে তাকিয়ে গোবিন্দবাবু বলে উঠলেন।

ভদ্রলোক ছুরিটা হাতে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে

লাগলেন।

–'হেঁ হেঁ, এটাকে যে-সে জিনিস ভাববেন না স্যার। স্বয়ং আকবর এটা উপহার দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরকে। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এই ছুরি যে কত কণ্ঠনালীর ওপর দিয়ে কচাৎ কচাৎ করে চলে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।' দোকানে অন্য কোনো খদ্দের না থাকলেও ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথাগুলো বললেন গোবিন্দবাবু।

ভদ্রলোক একমনে বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুরিটার ধার পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেক দিনের পুরনো জিনিস দেখলেই বোঝা যায়। বহুকাল পড়ে থাকার ফলে জং ধরে গেছে। পরিষ্কার করে নিলে এখনো যে কোনো জিনিস কাটার পক্ষে যথেষ্ট।

–'তা এর দক্ষিণা কত?' ভদ্রলোকের কাঁচাপাকা গোঁফ সমেত ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল

গোবিন্দবাবু মাথাটা চুলকে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'মানে, বুঝতেই তো পারছেন স্যার, একটা ঐতিহাসিক বস্তু, অনেক লুকিয়ে চুরিয়ে রাখতে হয়েছে, নইলে এতদিন হয়তো গভর্নমেন্টের ঘরেই চলে যেত। অন্য লোক হলে পুরোপুরি দু'শই নিতাম, কিন্তু আপনি ওই দেড়শই দেবেন।'

অন্য লোক হলে হয়তো প্রথমেই তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠত, কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রলোক কোনোরকম দরদাম না করেই মানিব্যাগ থেকে কড়কড়ে একটা একশো টাকার নোট আর একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন গোবিন্দবাবুর দিকে।

এটা গোবিন্দবাবুর তিরিশ বছরের দোকানদারি জীবনে একটা রেকর্ড। তিনি নিজেই প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। না স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই তাঁর নাকের ডগায় পাখার হাওয়ায় দুটো নোট ফড়ফড় করে উড়ছে। গোবিন্দবাবু হাতটা এগিয়ে দিলেন নোট দুটোর দিকে, তারপরই চিলের মতো ছোঁ মেরে সে দুটোকে সটান নড়বড়ে ক্যাশ-বাক্সটার মধ্যে চালান করে দিয়ে হেঁ হেঁ করে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে।–'মানে বুঝলেন না স্যার; কটা লোকে আর এ সব জিনিসের কদর বোঝে। এখনকার খদ্দের মাত্রই সব চাকচিক্যের দিকে নজর, আসল জিনিসটাকে কেউ আর চিনতেই চায় না। দেখুন দিকি আপনার মতন কি রকম সমঝদার লোক আজ ভগবান জুটিয়ে দিলেন! অক্ষয়, দে বাবা দে, স্যারকে জিনিসটা মুড়ে দে।'

রুক্ষ চেহারার মিশকালো একটা ছেলে এতক্ষণ দরজার পাশে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে ব্যাপারটা পিট্‌পিট্ করে লক্ষ্য করছিল। টানা তিন দিন বাদ মালিকের আদেশে একটা মনের মতো কাজ পেয়ে স্প্রীংয়ের মতো তড়াং করে লাফিয়ে উঠল।

–'তা স্যার এটা কি সাজিয়ে রেখে দেবেন, নাকি ব্যবহার করবেন? তা ধারও নেহাৎ কম নেই, একটু ঘষে-মেজে নিলেই একেবারে নতুন জিনিস।' গোবিন্দবাবু বুড়ো আঙুলটা তর্জনীতে ঠেকিয়ে যেন একবার শিউরে উঠলেন।

–'তা ধরুন মাঝে মধ্যে দরকার পড়লে চামড়া-টামড়া.....

লোকটা বলে কি? কসাই নাকি? তাও আবার দেড়শ টাকা দামের একটা একবেগদা ছুরি দিয়ে! গোবিন্দবাবুর হাঁ-টা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, এর মধ্যেই অক্ষয় এসে কাগজে মোড়া ছুরিটা এগিয়ে দেয় ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দবাবু বলে উঠলেন, 'এক মিনিট স্যার, আপনার বিলটা'–বলে ইঁদুরে কাটা একটা বিলবই-এর ওপর খস্‌খস্ করে দরদাম লিখে, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নামটা স্যার।'

–'আবার এসবের কি দরকার, আচ্ছা বেশ, লিখুন শ্রীঅলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন।

–'ধন্যবাদ, এই নিন স্যার।'

বিলটা চালান হয়ে গেল একটা কালো মানিব্যাগে।

–'আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

–'নমস্কার।'

ভদ্রলোকের জুতোর মচ্‌মচ্ শব্দ একসময়ে রাস্তায় গিয়ে মিলিয়ে গেল।

গোবিন্দবাবু হাত দুটো জোড় করা অবস্থাতেই হাঁ করে খানিকটা চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

ভদ্রলোক দোকান ছেড়ে চলে যেতেই অক্ষয় একলাফে তাঁর সামনে এসে বড় বড় চোখ করে বলে উঠল, 'ওঃ, আপনি কি খেলই দেখালেন! চিনে মার্কেটের পনেরো টাকার জিনিস,

তোতলাতে থাকেন, 'আ-আজ্ঞে।'

একেবারে একশ প-পঞ্চাশ টাকায়! তাও আবার জাহাংগীরের নামে!' তার চোখেমুখে তারিফ।

গোবিন্দবাবু এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্থ হলেন। সত্যিই এতদিনকার ব্যবসায়ী জীবনে একটা বিরাট কান্ড করে ফেলেছেন তিনি। একশ পঁয়ত্রিশ টাকা নেট্ প্রফিট। তিনি অত্যন্ত খুশি। 'জয় মা লক্ষ্মী, সাধে কি তোমায় লোকে স্মরণ করে। যাও বাবা অক্ষয়,চা নিয়ে এসো। নলিনের দোকানের মশলা দেওয়া চা, তার সংগে গরম ফুলুরি। আহা!'

সেদিন সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা মেঘলা। গোবিন্দবাবু অন্য দিনের মতো ফাটা গদিতে বসে বসে ঢুলছেন। অক্ষয় একমনে টুলে বসে মাছিগুলোর সংগে চোর চোর খেলছে। সেই দুদিন আগে এক বাজখাঁই ভদ্রলোক দেড়শ টাকায় জাহাংগীরের ছুরি সওদা করে নিয়ে গেলেন, তারপর থেকে আবার যে কে সেই। বসে বসে ঝিমোনো।

হঠাৎ একসংগে অনেকগুলো বুটের খটখট আওয়াজে গোবিন্দবাবুর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। প্রথমটা তিনি ভাবলেন বুঝিবা সেদিনের মতো কোনো খদ্দের। তারপরই দু হাত দিয়ে চোখ কচলে অনেকগুলো সাদা পোশাকের লাইন দেখে টানটান হয়ে উঠে বসলেন! অক্ষয়ের মুখে কেবল পু-পু....শব্দটা শোনা গেল।

সর্বনাশ, এ যে ইন্সপেক্টর অতীন বোস। যাঁর ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। তাঁর সংগে গোটাকতক চেলাচামুন্ডা। কিন্তু হঠাৎ এখানে কেন? তবে কি তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক কারবারের কথা জানাজানি হয়ে গেছে? গোবিন্দবাবুর মুখটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলির পাঁঠার মতো ভয়ে পা দুটো ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

–'আপনিই এ দোকানের মালিক গোবিন্দ সাঁতরা?' একটা ঝাঁঝালো গলার প্রশ্ন তেড়ে আসে গোবিন্দবাবুর দিকে।

কাঁপা গলায় তিনি তোতলাতে থাকেন, 'আ-আজ্ঞে। কি-কিন্তু কেন স্যার-র?'

–'এই বিলটা আপনার দোকানের?'

এক টুকরো কাগজ এগিয়ে আসে তাঁর চোখের সামনে। এ কি! এ যে গত পরশু দিনের সেই ভদ্রলোককে ছুরি বিক্রীর বিল। তাহলে কি তাঁর চিনে-মার্কেট রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন ভদ্রলোক! কিন্তু জানলেন কেমন করে?

গোবিন্দবাবু তখন ঘামতে শুরু করেছেন। ইন্সপেক্টরের প্রশ্নে তিন-চারবার ঢোঁক গিলে কোনোমতে মাথাটা একবার সামনের দিকে ঝোঁকালেন।

–'মানে একটা স্যাড নিউজ–' ইন্সপেক্টর যেন এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। 'সেদিন যে ভদ্রলোক আপনার দোকান থেকে ছুরিটা কিনে নিয়ে যায়, সে রাতেই সে আত্মহত্যা করে।'

–'আঁ!' গোবিন্দবাবু আঁতকে উঠে মুখ বিকৃত করলেন।

–'আমরা জানতে চাই ও আত্মহত্যা করেছে, নাকি কেউ পাকা হাতে ওর কণ্ঠনালীর ওপর দিয়ে ওই ছুরিটাই চালিয়ে দিয়েছে। কারণ ছুরির বাঁটটা খালি হাতে ধরা হয়নি। ধরা হয়েছে একটা কাপড় জড়িয়ে। সেই কাপড়ের টুকরোটা বিংশ শতাব্দীর জিনিস হতে পারে না! সুলতানি কিংবা মুঘল আমলের। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মত সেটাই।

আপনি হয়ত জানেন না যে খুন হয়েছে সে আসলে ছিল দাগী আসামী। পুলিশ অনেকদিন ধরেই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অপরাধ জগতে জাহাংগীর খাঁ নামেই ওর পরিচয়। আমরা আপনার কাছে জানতে চাই ওই কাপড়ের টুকরোটা দিয়েই কি ছুরিটা মোড়া ছিল? তা যদি হয় তো এটা আত্মহত্যাই।'

গোবিন্দবাবুর হাঁ-টা ক্রমশঃ বড় হচ্ছিল। এই প্রশ্ন শুনে 'আঁক' করে একটা শব্দ করে উঠলেন। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে একবার শুধু মাথাটা নাড়লেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'মৃতদেহের পাশে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে, তাতে একটা অদ্ভুত ছড়া লেখা রয়েছে। সেটা পড়লে মনে হয় ও আত্মহত্যাই করেছে।

'জাহাংগীরের ছুরির রহস্য অনেক ভাই।
সাজা দেবার আগে দোষটা জানা চাই।
পাপী ছাড়া কেউ একে কোরোনাকো ভয়।
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

গোলাপী কাগজের ওপর নীল কালিতে লেখা কবিতার চিরকুটটা গোবিন্দবাবুর চোখ থেকে ঝুলে পড়া চশমাটার সামনে খানিকক্ষণ নৃত্য করে আবার সোজা চলে গেল ইন্সপেক্টরের পকেটে।

–'ছুরিটা নিয়েই সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল', বললেন ইন্সপেক্টর,'আপনার দেওয়া বিলটাই সে রহস্য মিটিয়ে দিল। আপনিই তো এটা ওকে বিক্রি করেছিলেন?'

ভীষণ ভয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

–'আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আপনি তো কেবল বিক্রেতার ভূমিকা পালন করেছেন। তবে ওর এই আত্মহত্যা প্রমাণ করল, ক্রাইম ডাজ নট পে। আচ্ছা চলি, বিরক্ত করে গেলাম, নমস্কার।'

বুটের দংগল আবার মার্চ করতে করতে চলে গেল।

অক্ষয় পুলিশ দেখে পাশ কাটিয়ে পালাবে ভেবেছিল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের বৃত্তান্ত শুনে সেই যে দম ধরে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, সব চলে যেতে একটা বিস্ময়সূচক প্রবল শব্দ করে দমটা ছেড়ে বলল, 'কাপড়টা তো আপনি বিক্রি করেননি। তা হলে ব্যাপারটা কি হলো!'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'তা নিয়ে আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। যা হবার হয়েছে–ভাবুক পুলিশ। এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো।'

ছবিঃ গৌতম চক্রবর্তী

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেংগল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

সাত সাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে যেসব দস্যু ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত করে তুলেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ভয়ংকর মানুষটির নাম এডওয়ার্ড টিচ ওরফে ব্ল্যাক বিয়ার্ড। ঐ বোম্বেটে-দলপতির দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে ছিল দুর্জয় যোদ্ধা। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত নরদানব আত্মপ্রকাশ করে...
কুখ্যাত ঐ বোম্বেটে-দলপতি ব্ল্যাক বিয়ার্ডের যোগ্য সহকারী ছিল এক কিশোর দস্যু – ক্যাপ্টেন কিড ...
তুমি শুনলে খুশি হবে যে, ক্যাপ্টেন কিড নামক কিশোর জলদস্যুর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য তুমি নির্বাচিত হয়েছ। তবে তোমার পোশাকটা বদলাতে হবে। অষ্টাদশ দশকের পটভূমিতে এই পোশাক অচল।
পোশাক-পরিচ্ছদ শুটিং-এর আগে তৈরি করে নিলেই হবে। তার তো এখন অনেক দেরি আছে।
না, একটুও দেরি নেই। পৃথিবীর মানুষের মতো ইউরেনাস গ্রহের বাসিন্দারা অনর্থক সময় নষ্ট করে না। ছোট-খাটো কাজ আমরা মুহূর্তের মধ্যে করতে অভ্যস্ত। তোমার পোশাক বদলানোর ব্যাপারটা এখনই হয়ে যাবে ...
এইসব জুতো জামা কখনই চলবে না নয়া জামা, নয়া জুতো আর তলোয়ার উঠলে তনুর দেহে খুলবে বাহার – সুতরাং ভেলকি লাগ ঝটাপট আরিগাতো সুবিসোনা হিং টিং ছট্!

(চলবে)

Registration No. W. B./... of November '91 "Suktara